রাসবিহারীর আত্মকথা

ও

দুষ্প্রাপ্য রচনা

সংগ্রহ ও গ্রন্থনা

অ মল কু মা র মি ত্র

ঋদ্ধি

প্রকাশনী

১১এ, প্রতাপ চ্যাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

Published by :
Gokul Mitra
11A, Pratap Chatterjee Lane, Calcutta-700012

Cover Design :
Khaledh Choudhury, 2/1, North Range, Calcutta-700017

Cover Printing :
C. R. Kundu, 29/3, Nirmal Chandra Street, Calcutta-12

Text Printing :
Sarada Process, 5/1, Kashi Bose Lane, Calcutta-700006

First Published :
May 25, 1958,

● DEDICATION ●

This book in dedicated to Rashbehari's grand daughter

KEIKO

In remembrance of her visit to Chandannagar and her interest in the Country, for the liberation of which her grand father struggled lifelong.

Amal Kumar Mitra,
on behalf of
The People of India.



FOREWORD

Memoirs of Rashbehari .Bose need no introduction.

The treatise contains his only writing in mother tongue high-lighting why and how he sailed to the land of sunrise, along with a few of the articles on various subjects. He contributed these from Japan many years ago to the journals published by his friends at Chandannagar, the place of his ancestral home and early life. Due to the surveillance of the British rulers, those publications had to go under cover.

Posterity will be grateful to Sri Amal Kumar Mitra for the interest taken by him in hunting out the writings of Rashbehari Bose and presenting them on the auspicious occassion : the Birth Centenary of this illustrious son of India. New life has also been given to some rare photographs to prevent them from destruction. Sri Mitra has dedicated this collection to 'Keiko' the grand daughter of the luminary, in remembrance of her visit to Chandan-nagar in 1969.

Dr. Jadugopal Mukherjee, the renowned freedom fighter, rightly said, 'So great was Rashbehari that his height still remins unmea-sured'. Sixteen books written by him appeared in Japanese only. It is hoped, with the joint collaboration of the Indians and the Japanese, the works will be translated in other languages for the benefit of readers throughout the world.

S. K. Chakrabertty.

List of Plates

॥ সূচীপত্র ॥ Contents

এই গ্রন্থ সম্পর্কে বক্তব্য

সংগ্রামী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জন্মশতবর্ষে তাঁর কয়েকটি দুর্লভ রচনা, দৃষ্টির অগোচরে অপসৃত, কীটদংশিত, প্রাচীন পত্রিকার কবল থেকে উদ্ধার ক'রে এই গ্রন্থের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হল। গ্রন্থের কলেবর দেখে এই কর্তব্যপালনটুকু খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে। কিন্তু মনে হবার অন্য দিকও আছে।

একদা কি জানি কোন্ পুণ্যের ফলে আমাদের মত লিলিপুট অধ্যুষিত দেশে রাসবিহারীর মত গলিভার জন্মেছিলেন। সেই রাসবিহারী বসুর নিজ-কলম নিঃসৃত মাতৃভাষায় আত্মকথনের নিদর্শনটুকু গ্রন্থাকারে দীর্ঘজীবি করার প্রয়াস অন্তত এই কারণে মূল্যবান যে তাঁর আর কোন বাংলা লেখার সন্ধান পাওয়া যায় না। সহোদরা সুশীলাবালা সরকারকে লেখা চিঠিই শুধু বাংলায় লেখা, আর সব চিঠি দেখা যায় ইংরাজীতে। এই গ্রন্থেই প্রমাণ আছে, দিনলিপিও তিনি ইংরাজীতে লিখতেন। সুতরাং ভাষা ও বক্তব্য, উভয় দিক থেকেই 'রাসবিহারীর আত্মকথা' বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষণীয়।

১৯৬৩ সালে 'Rash behari Basu : His Struggle for India's Independence' নামক স্মারক গ্রন্থে রাসবিহারী বসুর কিছু ইংরাজী লেখা সংকলিত হয়েছিল। সেইগুলি ছাড়া লেখকরূপে রাসবিহারী আজও আমাদের কাছে অপরিচিত। একথা কিন্তু অজ্ঞাত নয় যে ওই লেখার জোরেই রাসবিহারী জাপানে ক্রমশ আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ইংরাজী ও জাপানী ভাষার যুগ্মশক্তিতে অক্লান্ত লেখনী চালিয়ে প্রাচ্য গোলার্ধ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রচার চালিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনমত ও আত্মনিবেদিত সৈন্যবাহিনী গঠনের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

'জাপান ও জাপানী, 'নিউ এশিয়া' 'এশিয়ান রিভিউ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় লিখে এবং জাপানী ভাষায় ষোলটি গ্রন্থ রচনা করে তিনি পূর্ব এশিয়ার চিন্তাজগতে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। জাপানী ভাষায় তাঁর বইগুলির নাম ও প্রকাশকাল বাংলায় লিখলে এইরকম দাঁড়ায় :

১। বৃহত্তর দৃষ্টিতে এশিয়ার বিপ্লব .... ১৯২৯।
২। ভারতের হাস্য পরিহাস ...... ১৯৩০।
৩। উৎপীড়িত ভারত ...... ১৯৩৩।
৪। ভারতীয় জনগণের কাহিনী ...... ১৯৩৫।
৫। বিপ্লবে ভারতীয় ...... ১৯৩৫।
৬। নতুন এশিয়ার জয়যাত্রা ...... ১৯৩৭।
৭। ভারতের আর্তনাদ ...... ১৯৩৮।
৮। ভাগবতগীতা ...... ১৯৪০।
৯। ভারতের করুণ ইতিহাস ...... ১৯৪২।

১০। ভারত বিষয়ে বক্তব্য ...... ১৯৪২।
১১। স্বাধীন ভারতের উষাকাল ...... ১৯৪২।
১২। স্বাধীনতা সংগ্রাম ...... ১৯৪২।
১৩। রামায়ণ ...... ১৯৪২।
১৪। শেষের কবিতা .... ১৯৪৩।
(রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার জাপানী অনুবাদ)
১৫। ভারতবাসীর ভারত ...... ১৯৪৩।
১৬। বসুর আবেদন ...... ১৮৪৪।

এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু আমাদের পরিচয়-পরিধির মধ্যে অবস্থিত কিন্তু অপর বইগুলিতে কি তিনি লিখে গেছেন তা সঠিকভাবে আজও আমরা জানিনা। ওইসব অমূল্য গ্রন্থরাজির স্বাদ অনুবাদের মাধ্যমে এখনো আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। এই অপরিমেয় অকৃতিত্বের কথা তাঁর জন্মের শতবর্ষ-স্মরণিকায় বড়ই বেদনাদায়ক। এই ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থের মাধ্যমে 'লেখক' রাসবিহারীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। আশা করব, সমধর্মী প্রয়াস নতুন করে আর্বিভূত হবে, 'লেখক' রাসবিহারী ভারতে অজ্ঞাত থাকবেন না।

রাসবিহারী বসু কি ভাবে ভারত থেকে জাপানে গেলেন সে বিষয়ে ডঃ কালিদাস নাগ লিখেছেন 'সে সব গল্প তিনিই হাসতে হাসতে কবিগুরুকে ও আমাদের শুনিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে, যখন আমরা চীন পরিক্রমা শেষ করে জাপান যাই। (ভূমিকা ঃ মতিলাল রায়—আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী।)

ওই একই বছর, ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে 'রাসবিহারীর আত্মকথা' মতিলাল রায় সম্পাদিত চন্দননগরের সাধনা প্রেস থেকে মুদ্রিত, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'প্রবর্তক' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে সুরু হয়। একই বছরের পৌষ সংখ্যায় 'রাসবিহারীর আত্মকথা' 'শেষ হয় প্রথম খণ্ড সমাপ্ত' ঘোষণার মাধ্যমে। এর পরেই 'প্রবর্তক' কয়েক মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। মতিলাল রায় রচিত পুস্তকাদি ও প্রকাশনা বিপর্যস্ত হয় চন্দননগরের ফরাসী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মঃ শামুপিয়ে'র অশিষ্টাচারে এবং তার পরেই বৃটিশ সরকারের একটি নিষেধাজ্ঞায়, যার বলে প্রবর্তক পাবলিশিং এর কোন প্রকাশনাই আর বৃটিশ ভারতে ঢুকতে পারবে না। 'প্রবর্তক' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা নব পর্যায়ে ১৩৩২ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে সুরু হয় কোলকাতা থেকে। তাতে রাসবিহারী বসুর লেখা আর দেখা যায় না।

প্রবর্তকের যে সংখ্যায় 'রাসবিহারীর আত্মকথা' শেষ হল, সেই পৌষ সংখ্যাতে দেখা যায় জাপানের বিশিষ্ট নেতা মিৎসুরু তোয়ামা সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ লেখা। লেখকের নাম দেওয়া নেই, উল্লেখ আছে 'জাপানী প্রবাসী লিখিত'। লেখাটি রাসবিহারী বসুর হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় কিন্তু যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় রাসবিহারীর আত্মকথা লেখা, সে ভাষায় ওটি লেখা নয়, রাসবিহারীর স্বভাবসুলভ ইংরাজী কথাও ওতে মেশানো নেই। প্রবল উৎসাহে অনুসন্ধান চালিয়ে

আবিষ্কার করি-ওটি রাসবিহারীরই লেখা, মূল লেখা ইংরাজীতে ছিল, কেউ অনুবাদ করে প্রবর্তকে ছাপিয়েছিলেন। মূল ইংরাজী লেখাটি পাওয়া গেল 'দি স্ট্যাণ্ডার্ড বিয়ারার' পত্রিকায় (জুন, ১৯২৭), তাতে লেখক হিসাবে রাসবিহারী বসুর নাম স্পষ্ট লেখা আছে। প্রবর্তকে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদটি একটু সংস্কার করে এই গ্রন্থে ছাপার ইচ্ছা হয়েছিল। সে ইচ্ছা দমন করেছি এই ভেবে যে ওই অনুবাদটি রাসবিহারী বসুর ইংরাজী লেখার প্রথম বাংলা অনুবাদ—এটি অবিকৃত দলিল হিসাবে রক্ষা করা উচিত। অনুবাদকের নামটি জানবার এখন কোন উপায় নেই কিন্তু রাসবিহারী বসুর লেখার অনুবাদ কর্মে তাঁকে পথিকৃৎ হিসাবে শ্রদ্ধা করতে কোন বাধা নেই। তাই সে লেখা যেমন ছিল তেমনি এই গ্রন্থে ছাপা হল।

ওই ইংরাজী লেখাটি আবিষ্কারের পর একটি অদ্ভুত প্রশ্ন মনে জেগেছে। রাসবিহারী তাঁর আত্মকথা বাংলায় লিখলেন কেন? মতিলাল রায় কি তাঁর কাছ থেকে বাংলায় লেখা চেয়ে পাঠিয়ে ছিলেন?

দীর্ঘ আটবছর পরে রবীন্দ্র সান্নিধ্যেই রাসবিহারী মাতৃভাষায় মনের অর্গল খুলতে পেরেছিলেন।

আমার যেন মনে হচ্ছে, ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ রাসবিহারীর গৃহে পদার্পণ করার ফলে এই বাংলা লেখাটির জন্ম হয়েছে।

প্রথম বিচারে সেটা অসম্ভব। কারণ রাসবিহারীর আত্মকথা প্রবর্তকে ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে সুরু হয়েছে, অর্থাৎ ১৯২৪ সালের মে মাস থেকে। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপান সফর শেষ করে দেশে ফেরেন ১৯২৪ সালের ২১ শে জুলাই। তার মানে 'রাসবিহারীর আত্মকথা' তখন প্রবর্তকে ছাপা সুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের পূর্বেই রাসবিহারীর বাংলায় আত্মকথা লেখা সুরু করেছিলেন।

কিন্তু যদি এমন হয়ে থাকে যে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবর্তক জ্যৈষ্ঠ মাসে আদৌ বেরোয়নি, কয়েকমাস পরে বেরিয়েছে? অর্থাৎ প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত হলেও মাসের হিসাবে প্রবর্তক কয়েকমাস পিছিয়ে ছিল?

সে রকমটা ঘটা সম্ভব বলে আমার মনে হয়েছে। ১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্যায় মিৎসুরু তোয়ামা বিষয়ক যে অনুবাদটি ছাপা হয়েছিল তাতে একটি ছোট অথচ মারাত্মক ছাপার ভুল আছে, যা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি চন্দ্রবিন্দুর তফাৎ। অনুবাদে আছে—"প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লবে চীনের মুক্তিদাতা ডাক্তার সান-ইয়াত সান যে বিজয় লাভ করেন…" ইত্যাদি। আর মূল ইংরাজী লেখার ওই লাইনে সান-ইয়াত-সান নামের আগে Late কথাটি আছে। তার মানে রাসবিহারীর ওই রচনা সান-ইয়াত সান এর মৃত্যুর পর লেখা। ইতিহাস বলে ডাঃ সান-ইয়াত সানের মৃত্যু হয়েছিল ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ। তাহলে রাসবিহারীর মিৎসুরু তোয়ামা বিষয়ক লেখাটি ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে (১৩৩১, পৌষ) ছাপা হয় কি করে, যদিনা প্রবর্তক পত্রিকা মাসের হিসাবে অন্তত চার-পাঁচ মাস পিছিয়ে থাকে?

সুতরাং বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য করা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্বগৃহে ক্ষণিকের অতিথি হিসাবে পেয়ে রাসবিহারীর মনে মাতৃভাষার একটি তরংগ উঠেছিল, এমন এক কল্পনাবিলাস আমি পরিত্যাগ করতে পারছি না। আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু ভুল ভাঙার মত তথ্য হাতের কাছে পাইনি। 'রাসবিহারীর আত্মকথা' থেমে যাবার সম্ভাব্য কারণের মধ্যে একটি আমার মনে হয় ১৯২৫ সালে ৪ঠা মার্চ সহধর্মিণী তোষিকোর মৃত্যু। তোষিকোকে তিনি বাংলা শেখাচ্ছিলেন।

রাসবিহারীর আত্মকথায় দেখা যাবে কিছু নাম সরাসরি উল্লেখ আছে, কয়েকটি ইংগিতে বলা আছে, কয়েকটি ছদ্মনাম রয়েছে। যাঁরা ১৯২৪ সালের পূর্বে ফাঁসীতে আত্মদান করেছেন এবং যাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল, তাঁদের নাম সরাসরি আছে। যাঁদের নাম তখন প্রকাশ করা সমীচিন ছিলনা তাঁদের নাম ইংগিতে আছে। পাঠকের সুবিধার্থে প্রকৃত নামগুলি নির্ণয় করে পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'নি' র প্রকৃত নাম নির্ণয় করতে পারিনি। ৮ পৃষ্ঠায় রাসবিহারীর লেখায় আছে গিরিজাবাবুর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (বন্দীজীবন ২ খণ্ড, পৃঃ ৬৮) ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে গিরিজাবাবুর আসল নাম নগেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হয়ে ১৯১৮ সালে আগ্রা জেলে মারা যান।

রাসবিহারী বসুর লেখা প্রবর্তকে ছাপার বছর তিন আগে থেকে Standard Bearer পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল।

এই ইংরাজী পত্রিকাটির মূলেও ছিলেন চন্দননগরের মতিলাল রায়। এটি সাপ্তাহিক হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালের ১৫ই আগষ্ট। কে এর সম্পাদক, কারাই বা লেখক, কোথা থেকে প্রকাশিত, সে সব কিছুই উল্লেখ করা হোত না। সে উল্লেখ না থাকলেও আমরা জানি যে নলিনচন্দ্র দত্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওই পত্রিকা কোলকাতার কার্তিক বসু লেন থেকে বের হত। এই পত্রিকায় রাসবিহারী বসুর নাম উল্লেখ করে অনেকগুলি লেখা 'নোটস ফ্রম জাপান' শিরোনামায় ১৯২২—২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সে লেখাগুলি ১৯৬৩ সালে পূর্বোক্ত স্মারক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই পত্রিকার কোন সংখ্যা আমি খুঁজে পাইনি। সম্ভবত এটি বন্ধ হয়েছিল। ১৯২৭ সালে ওই পত্রিকা মাসিক হয়ে The Standard Bearer নামে আরো কিছুকাল চলে। তখন পাঠকদের জানানো হয়, এর সম্পাদক অরুণচন্দ্র দত্ত, এটি প্রবর্তক সংঘের ইংরাজী মুখপত্র, প্রকাশ হয় ২৯ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কোলকাতা থেকে, ১৯২০ সালের প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটি ছিল শ্রীঅরবিন্দের, ইত্যাদি। যাইহোক, ১৯২৭—২৮ সালে এই পত্রিকায় রাসবিহারী বসুর স্বনামে যে সব লেখা পাওয়া গেছে সেগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হল।

ইংরাজী লেখাগুলি বাংলায় অনুবাদ করে দিইনি বলে অভিযোগ উঠতে পারে। কৈফিয়ৎ হিসাবে জানাই, বাংলা অনুবাদ থাকলে বাঙালী পাঠক রাসবিহারীর মূল রচনার স্বাদ এড়িয়ে যেতে পারেন মনে ক'রে অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত করিনি।

The National Awakening of China শীর্ষক লেখাটি ভারতে পাঠিয়ে রাসবিহারী সম্ভবত চীনের জাতীয় জাগরণ সম্পর্কে ভারতবাসীকে ওয়াকিবহাল করতে চেয়েছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯২২ সালে তিনি শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে যে সব চিঠি লেখেন তার একটিতে ছিল এই রকম কথা—

"আমরা এ যাবৎ কেবল ভারতের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা আমি কতক কতক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। এইজন্য আমার পূর্বের অনেক মতামতের পরিবর্তন হইয়াছে। তাই একটি কথা মনে রাখিও- পরিশেষে আমাদিগকে সমগ্র পৃথিবীর সমস্যা লইয়াই মাথা ঘামাইতে হইবে, এ বিষয়ে নিয়তিই আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে…"

এই বক্তব্যের সমর্থনে লক্ষ্য করা যায় যে স্টান্ডার্ড বিয়ারার পত্রিকায় ১৯২১—২৩ সালে রাসবিহারী যে সব লেখা পাঠিয়েছিলেন তাতে শুধু চীন নয়, সমগ্র পূর্ব এশিয়া এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিয়মিত সাংবাদিকতা রয়েছে। ১৯২৭ সালে চীনের জাতীয় জাগরণ সম্পর্কে রাসবিহারীর লেখা তুলনা করা যায় একই বছরে একই বিষয়ে 'লন্ডন সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্ববিখ্যাত লেখক ডঃ এইচ. জি. ওয়েলস্ এর লেখার। রাসবিহারী যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুসরণে একটুও পিছিয়ে পড়েননি এমন কথাই মনে হবে দুটি লেখা তুলনা করে।

What is Nichirenism শীর্ষক রচনাতে রাসবিহারী এক স্বদেশব্রতী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর রচনা যে কত বৈচিত্রগামী ছিল এটি তারই এক নিদর্শন। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধসংস্কৃতি ম্রিয়মাণ হলেও সূর্যোদয়ের দেশে গিয়ে তার উত্তাপ রাসবিহারী অনুভব করেছিলেন, বুদ্ধদেবের দেশ থেকে গিয়েছিলেন বলে জাপানে তাঁর প্রতি যে বিশেষ সৌজন্য দেখানো হয়েছিল, সে কথা তিনি আত্মকথায় লিখেছিলেন।

Anachronistic Admiration শীর্ষক রচনায় উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার বিষয়ে তৎকালীন জাপানীদের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। একথাও জানা যাবে, ১৯২৩ সালে রাসবিহারীর ভারতবিষয়ে ভাষণ জাপানের রাজপুত্র গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। রাসবিহারী জাপানের রাজপরিবারে কত সম্মানিত মানুষ ছিলেন সে কথা জানা যায় দি স্ট্যাণ্ডার্ড বিয়ারার পত্রিকার ১৯২৮ এপ্রিল সংখ্যায়। ইম্পিরিয়াল চেরি ব্লসম গার্ডেন পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ হয়েছিল,—Mr. Bose is the first non-official Indian to be thus honoured.

দি স্ট্যাণ্ডার্ড বিয়ারার পত্রিকার জানুয়ারী, ১৯২৮ সংখ্যায় একটি সংবাদ পাওয়া যায়। ১৯২৭ সালের ৩রা নভেম্বর সাংহাইতে এশিয়াবাসীর একটি সম্মেলন হয়। জাপান, চীন, কোরিয়া, পারস্য, শ্যাম, আবগানিস্তান, তুর্কিস্থান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় দেশগুলি যেমন বোঝাপাড়ার মধ্যে এশিয়ার বিরুদ্ধে এক জোট হয় তেমনি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এশিয় দেশগুলির ঐক্য সংগঠিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে মসিয়ে পল রিচার্ড

জাপানী বন্ধুদের সহায়তায় 'এশিয়ান রিভিউ' পত্রিকার পত্তন করেছিলেন। সেটি তখন বন্ধ হয়ে গেলেও সেই আদর্শটি সাংহাই কনফারেন্সের প্রাণশক্তি হয়েছিল। এতে ভারতের পক্ষ থেকে ধ্বনি তুলেছিলেন রাসবিহারী বসু, আবগানিস্থানের পক্ষ থেকে বক্তব্য রেখেছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। সম্মেলনের একটি ছবিতে দেখা যায় রাসবিহারী বসু, চিয়াং-কাইসেকের লেফটেনেণ্ট ইয়াং জোকো, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং অন্যান্য কয়েকজনকে।

রাসবিহারীর জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন রাসবিহারী 'এশিয়ান রিভিউ' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সুরু হয়। সুরু থেকে ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সংখ্যাগুলি উল্টে দেখে আমি রাসবিহারীর স্বনামে কোন লেখা খুঁজে পাইনি। ভারত বিষয়ে বহু লেখা ও সংবাদ এই পত্রিকায় রয়েছে, এমনকি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'সাগর-সংগীত' কাব্যগ্রন্থের (ইংরাজী অনুবাদের) আলোচনা, মতিলাল রায়ের ছবি সহ তাঁর আশ্রম জীবনের সমীক্ষা, রবীন্দ্রনাথের কথা, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলী শুধু ভারতেরই নয়, সারা দুনিয়ার। এর কয়েকটি লেখা রাসবিহারীর বলে অনুমান করতে পারলেও প্রমাণাভাবে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম না। একই সময়ে স্ট্যাণ্ডার্ড বিয়ারার পত্রিকায় স্বনামে লেখা পাঠালেও জাপানে নাগরিকত্ব লাভের পূর্বে হয়ত সেখানে কোন সতর্কতার প্রয়োজন ছিল।

'নিউ এশিয়া' পত্রিকার কোন সংখ্যা আমি খুঁজে পাইনি।

পরিশিষ্ট অংশে যাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল তাঁরা হলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল ও মতিলাল রায়ের ঘনিষ্টজনের। এঁদের উল্লেখ রাসবিহারী তাঁর আত্মকথায় করেছেন। একালে এঁরা স্মরণীয় হলেও সুপরিচিত নন। শ্রীশচন্দ্রের একটি অতি মূল্যবান লেখা 'রাসের বিপদ' পুণর্মুদ্রিত হল। কেন হল, পাঠক সেটি পড়লেই বুঝতে পারবেন। রাসবিহারী-সহোদরা সুশীলাবালা সরকারের দুটি চিঠিও গ্রন্থভুক্ত করা হল। রাসবিহারীর দৌহিত্রীর একটি মিষ্টি চিঠি দিয়ে গ্রন্থ শেষ করা হল।

স্ত্রী-পুত্র সহ রাসবিহারীর ফটোটি ১৯২০ সাল নাগাদ জাপানে তোলা। তাঁর অজ্ঞাতবাস তখনো শেষ হয়নি তবু ওই ছবি তিনি চন্দননগরে পাঠিয়েছেন। শ্রীশচন্দ্রর 'রাসের বিপদ' রচনার সাথে ওই ছবি প্রবর্তকে ছাপা হয়েছিল। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত টোকিওর ম্যাপটিও তাঁরই পাঠানো, এটিও শ্রীশচন্দ্রের লেখার সাথে প্রকাশিত হয়েছিল। মিৎসুরু তোয়ামার ফটোও রাসবিহারীর পাঠানো, তাঁর লেখার সাথে প্রবর্তকে ও স্ট্যাণ্ডার্ড বিয়ারার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কীট-দংশিত ছবির ওপর ইচ্ছা করেই কোন ফিনিশিং করা হয়নি, সেগুলি কোন পথে এগিয়েছে জানাবার জন্য।

চন্দননগরের ফটকগোড়ায় অবস্থিত রাসবিহারীর বাড়ির যে ছবি ছাপা হয়েছে সেটি রাসবিহারীর ভ্রাতা বিজনবিহারী রচিত 'কর্মবীর রাসবিহারী' গ্রন্থের। ওই বাড়ির আদি চেহারা ঠিক ওইরকম ছিল না, বর্তমানে আরো একটু পরিবর্তিত হয়েছে।

ডঃ জি. জে. অশোয়ার 'দি টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইন জাপান' গ্রন্থ থেকে রাসবিহারীর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের ছবিটি এবং রাসবিহারীর বাংলা হস্তাক্ষর ব্লক করা হয়েছে। স্ত্রীপুত্র সহ রাসবিহারী, শ্রীশচন্দ্র ও জ্যোতিষচন্দ্রের ছবিগুলি ইতিপূর্বে অজিতমোহন গুপ্ত সম্পাদিত 'চিত্রাঙ্গদা' ও আমার সম্পাদিত 'চন্দননগর সংস্কৃতি সম্মেলন' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। বিষ্ণুগনেশ পিঙ্গলের ছবি এঁকেছেন শ্রী অলক মিত্র। আজাদ হিন্দ ফৌজের ছবি মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জির 'ইণ্ডিয়াস স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম' গ্রন্থ থেকে নেওয়া, এর ব্লক শহীদ-স্মারক সমিতির সৌজন্য ও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ব্লক অজিত মোহন গুপ্তের সৌজন্যে ব্যবহৃত। ইতিপূর্বে 'কম্পাস' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধের অংশ প্রয়োজন বোধে এই গ্রন্থে ব্যবহার করেছি।

সুদীর্ঘকাল প্রবর্তক আশ্রমবাসিনী মতিলাল-শিষ্যা শ্রীযুক্তা রেণুকণা ঘোষ (জন্ম ৩১শে শ্রাবণ, ১৩২০, পিতা ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ, পিতৃব্য ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষ) পুরানো পত্র পত্রিকা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন, মতিলাল রায় ও তাঁর ঘনিষ্টজনের ছবিটির নেগেটিভ করে নিতে দিয়েছেন এবং আশীর্বাদ জানিয়ে এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করেছেন। মাত্র মাস দুই আগে এই গ্রন্থ প্রকাশের কর্তব্যটি আমার মস্তিষ্কে জাগ্রত করে প্রত্যহ উৎসাহ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী। দেশে বিদেশে রাসবিহারী বসুর রচনা সম্পর্কে গবেষণা হতে পারে চিন্তা করে এই বইতে কি আছে সে কথা শ্রী চক্রবর্তী ইংরাজীতে লিখে দিয়ে এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। শ্রী গোকুল মিত্র নির্দয় তাগিদ দিয়ে গ্রন্থনার কাজ শেষ করিয়েছেন। এ গ্রন্থের যা ত্রুটি তা একা আমারই জন্য, যা কিছু গৌরব সবই স্বর্গত রাসবিহারী বসুর।

অমল কুমার মিত্র

● প্রকাশকের নিবেদন ●

পূর্ব এশিয়ার বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই এই বই-এর প্রকাশ। তাঁর যথোপযুক্ত মূল্যায়ন আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাঁরা এই বই প্রকাশে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি থাকল আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। পাঠক বর্গের কাছে এই বই পেঁছে দেওয়ার ভার পেয়ে আমি গর্বিত। ইতস্ততঃ ছড়ানো ও ধ্বংসোন্মুখ লেখা ও ছবি ভাষা পেয়েছে এই গ্রন্থে। আশা করি পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের সমাদর করবেন।

প্রণতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সহকারে

ঋক্ প্রকাশনী
১১/এ প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

A rare photo taken in Japan, sometime in 1920.



রাসবিহারী বসু (১৮৮৬—১৯৪৫) মহীয়সী পত্নী তোষিকো বসু (১৮৯৭—১৯২৫
পুত্র মাশাহিদে বসু (১৯১৯—১৯৪৩ বিশ্বযুদ্ধ)



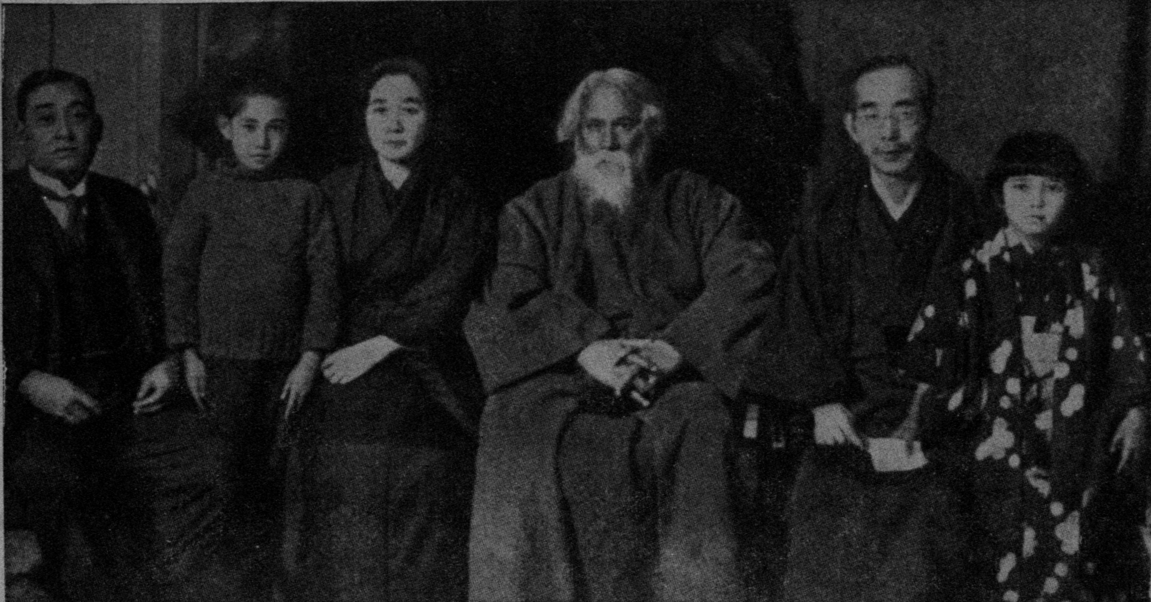
চন্দননগর ফটকগোড়ায় রাসবিহারীর পৈতৃক বাড়ি



শচীন্দ্রনাথ সান্যাল



বিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে

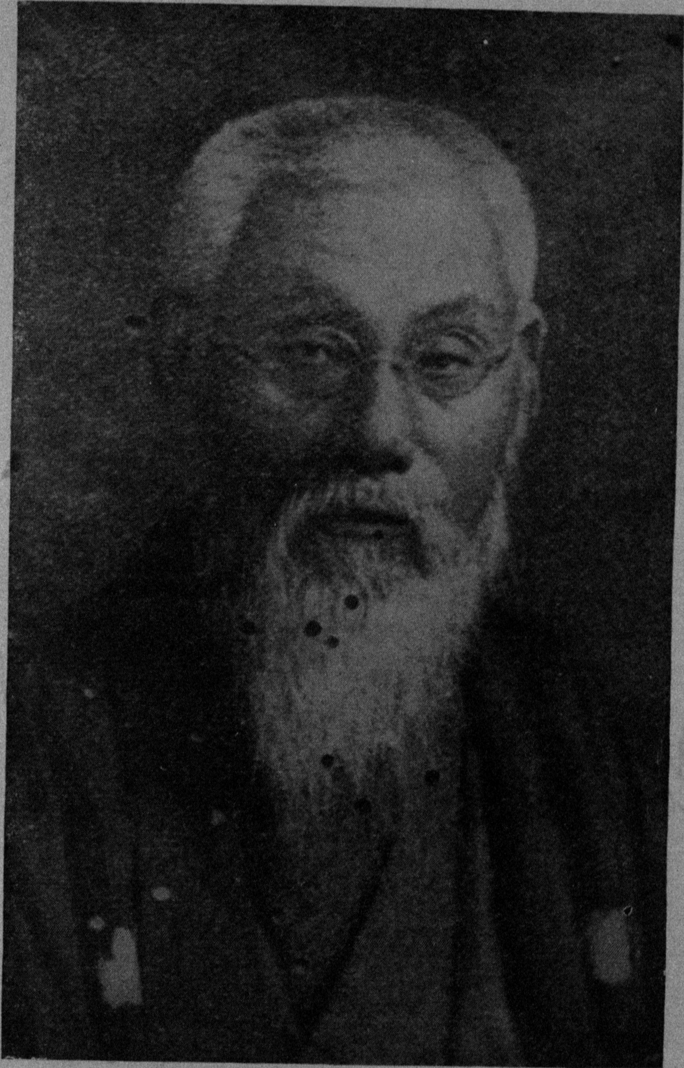


১৯২৪ সালে রাসবিহারী-গৃহে ক্ষণিকের অতিথি রবীন্দ্রনাথ

বাঁদিক থেকে—রাসবিহারী বসু, পুত্র মাশাহিদে, শ্বশ্রূমাতা কোক্কো সোমা, রবীন্দ্রনাথ, শ্বশুর আইজো সোমা, কন্যা তেতুকো।

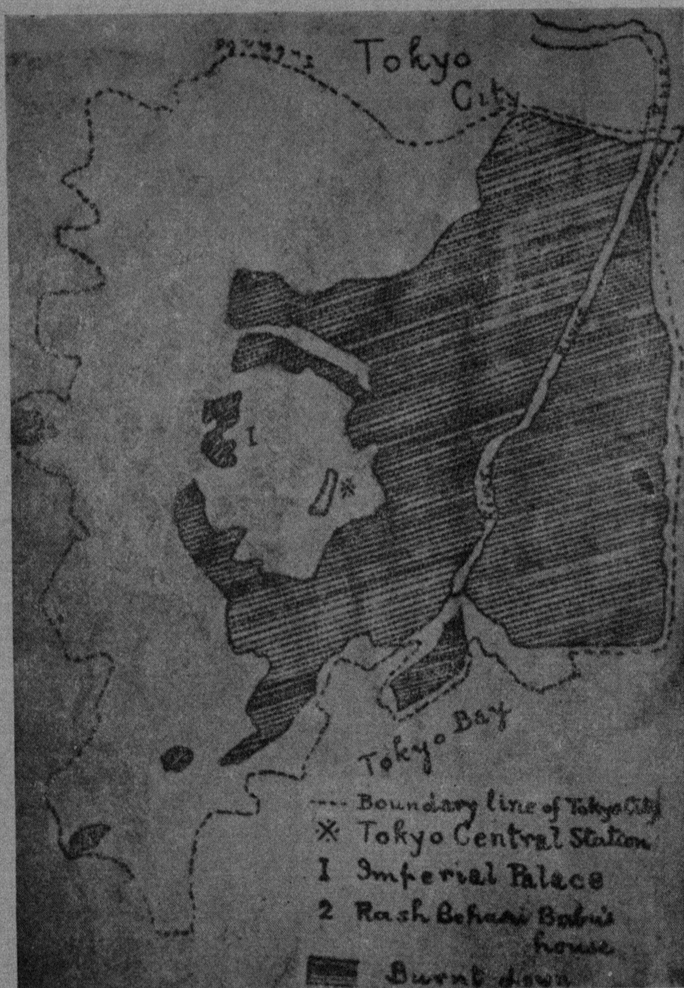
4

Mitsuru Toyama



মিৎসুরু তোয়ামা

Earthquake disaster in Tokyo—1923



১৯২৩ সালের ভূমিকম্পে টোকিও

2—রাসবিহারীর ভগ্ন বাসস্থান

শ্রীশচন্দ্র ঘোষের 'রাসের বিপদ' দ্রষ্টব্য



২৬ বছর বয়সে মতিলাল রায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠজন
চিত্রপরিচিতি পরিশিষ্ট অংশে দ্রষ্টব্য

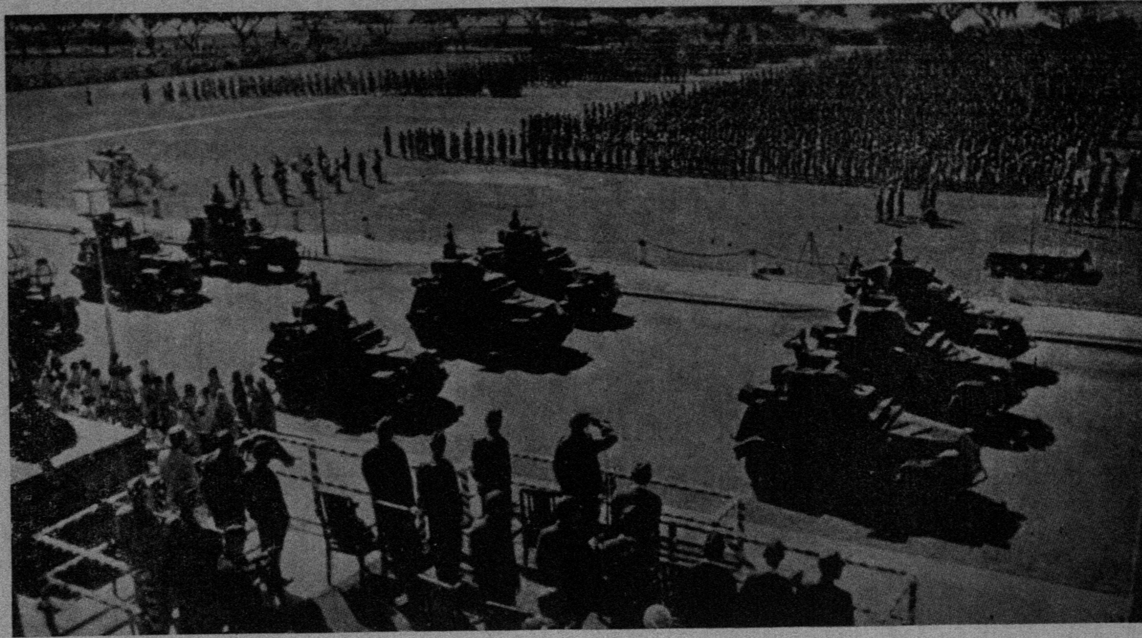


জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ



শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

6th July 1943, Azad Hind Fouz's first Salute to Subhas Chandra Bose at Singapore.



৪ঠা জুলাই ১৯৪৩, রাসবিহারী তাঁর বক্ষপঞ্জর দিয়ে গড়া ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্‌ডেন্স লীগের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তুলে দেবার পর ৬ই জুলাই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সুভাষচন্দ্রকে সিঙ্গাপুরে প্রথম সামরিক অভিবাদন জানাচ্ছেন।



রাসবিহারীকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ জাপানী সম্মানপত্র ও পদক দেখাচ্ছেন রাসবিহারী-কন্যা তেতুকো ও তাঁর স্বামী শ্রীহিগুচি।

রাসবিহারীর আত্মকথা

॥ কলিকাতা হইতে টোকিও ॥

● কেন আমি ভারত ত্যাগ করিলাম ●

১৯১৫ সালের মার্চ্চ মাস। আমি তখন বেনারসে আসিয়াছি। লাহোরের ব্যর্থ উদ্যমে ধাক্কাটা প্রথম বড় বেশী লাগিয়াছিল। কিন্তু এজন্য আমি তত দুঃখিত হই নাই। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম যে আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ যারা কার্জ করিতেছিল এমন অনেকেই ধরা পড়িয়াছে, তখন বড়ই দুঃখ হইল। যতবার এই সমস্ত সংবাদ পড়ি, ততবার দরদর করিয়া চোখ থেকে জল পড়ে। লাহোরেতে ব্যর্থ হইলেও "Through failure, we mount to success" এটার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়া, ততটা নিরাশ হই নাই। এবারের experinenceটা ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে। ভবিষ্যতে এবারের মত ভুল করিব না—এই রকম ভাবিতেছিলাম। কিন্তু পরম স্বার্থ-ত্যাগী, দুঃসাহসিক, সকলপ্রকার বিপদে বিপর্য্যয়ে অচল অটল যারা, এমন সব লোকেরা যখন ধরা পড়িল, তখন মনে একটা বড়ই আঘাত বাজিল। যাঁরা ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিবে তাদের ত আর ফিরিয়া পাইব না—এই ভাবনায় বুকটা যেন ফাটিয়া যাইবার মতন হইল। তারপর যখন সংবাদ পাইলাম যে, পিঙ্গলেও মিরাটে ধরা পড়িয়াছে, তখন একেবারে প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। একটি ছেলে 'পাইওনিয়ার' কাগজখানি আনিয়া দিলে, খুলিয়া দেখি যে মিরাট থেকে ১টি টেলিগ্রাম। তাতে পিঙ্গলে এবং আর কয়েকজন শিখ সৈনিক 'বোমা' সমেত ধরা পড়িয়াছে, এই কথা লেখা আছে। চোখের জল আর থামে না। কাগজ পাইবার পূর্ব পর্য্যন্ত এই স্থির করিয়াছিলাম, যে কোন রকমে এবার পিঙ্গলে ফিরিয়া আসিলে আর তাকে আমার কাছ-ছাড়া করিব না।

এর আগেকার কিছু ঘটনা বলি। লাহোরে যখন ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর লাহোরে থাকিয়া কোনও লাভ নাই, এই ভাবিয়া বেনারস কিম্বা বাংলায় ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিলাম। তখন একটি পুরাতন বন্ধু বলিলেন, এ সময়ে পুলিশ প্রত্যেক ট্রেন 'ওয়াচ' করিতেছে, আপনাকে এ সময়ে আমরা কখনই বিপদের মুখে যাইতে দিব না। তার উত্তরে আমি বলিলাম যে, পুলিশ নজর রাখিতেছে বলিয়াই এখন লাহোর থেকে বাহির হইয়া যাওয়া খুব সহজ। পূর্ব্বেও দুইবার পুলিশ এই রকম দিল্লী ষ্টেশনে watch করিয়াছিল, তখন খুব সহজেই দিল্লী থেকে বাহির হইয়া যাইতে পারিয়াছিলাম। পুলিশদের বুদ্ধিটা একটু মোটা। এধার ওধার চাহিয়া কেহ follow করিতেছে কিনা, এই ভাবে গেলে পুলিশের হাত থেকে সরা মুস্কিল। কিন্তু ঠিক একজন ভদ্রলোক প্যাসেঞ্জারের মত গাড়ী করিয়া আসিয়া, নামিয়া গাড়োয়ানকে চার আনার 'টিপ' (বক্সিস) দিয়া বরাবর সটান বুকিং অফিসে গিয়া, টিকিট কিনিয়া, ট্রেন আসা পর্য্যন্ত বেঞ্চে বসিয়া খবরের কাগজ কিম্বা কোন বই

পড়, পুলিশের বাবাও কখন সন্দেহ করিতে পারিবে না। তাছাড়া পুলিশ এখন অধিকাংশ প্যাসেঞ্জারের উপরেই নজর রাখিবে, সেইজন্য তাদের মনোযোগ একমুখী না হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে। সেইটাই আমাদের পক্ষে মহাসুযোগ। এই ব্যাপারটা বন্ধুকে বুঝাইয়া দিয়া একটি মারাঠী ছেলেকে[১] সঙ্গে করিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় লাহোর ষ্টেসনে আসিলাম। পাঞ্জাবী পোষাক, মাথায় একটা প্রকাণ্ড রকমের পাগড়ী ও সঙ্গে একটি গুলিভরা "মসার" পিস্তল। এক্কা থেকে নামিয়া সটান ষ্টেশন প্লাটফরমে আসিয়া হাজির হইলাম। টিকিট দুইখানা আগেতেই কিনাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুই মিনিট অপেক্ষা না করিতেই দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবার গাড়ী আসিল। আমরা দুইজন উঠিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গী ছেলেটিকে ঘুমাইবার ভান করিবার জন্য বলিয়া, আমি নিজেও নাক ডাকাইয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল। ছাড়িবার সময় দেখিলাম, আমার পুরাতন বন্ধুটি প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি নিরাপদে লাহোর ছাড়িয়া চলিলাম দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সকালে গাজিয়াবাদে নামিয়া পড়িয়া ট্রেন বদল করিলাম। গাজিয়াবাদে নামিয়া দেখি আমার পরিচিত দেরাদুনবাসী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ষ্টেশনে বসিয়া আছেন, কিন্তু আমার পোষাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না এবং চিনিতে পারিলেও কখনও আমায় ধরাইয়া দিতেন না। যাহা হউক, গাজিয়াবাদ হইতে ই, আই, রেলওয়েতে আসিয়া মোগলসরাই-এ গাড়ী বদল করিয়া বেনারসে পরের দিন সকালে পৌঁছিলাম। বেনারস ষ্টেশনে পুলিশ খুবই সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছিল। কিন্তু বুদ্ধিটা মোটা হওয়ার দরুণ ঠিক উল্টা লোকদের সন্দেহ করিতেছিল। যাক, তখনও পর্য্যন্ত পিঙ্গলের কোনও সংবাদ পাই নাই। সে জন্যে একটু চিন্তিত ছিলাম। ঠিক দুইদিন পরে পিঙ্গলে আসিয়া হাজির। তাহাকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া যে কত আনন্দ হইল তা ভাষায় বলা যায় না। সে মিরাটের সিপাইদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছে। আমি হুকুম দিলেই সে মিরাটে গিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারে। আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও যাকে আমি ভালবাসি এবং আপনার বলিয়া মনে করি, যার সাহসিকতা, স্বদেশপ্রেম এবং আত্মদানের ভাবে আমি মুগ্ধ, যার সাহায্য না হইলে আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না, সেই প্রাণের ভাই শচীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তখন শচী বাড়ীতে থাকিত না। পুলিশ কখন শচীনের বাড়ী ঘেরাও করে, তাহার স্থিরতা নাই। কাজেই ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, শচী বাড়ীতে না থাকিয়া একটি বন্ধুর বাড়ীতে থাকিবে। শচীর সহিত পরামর্শ করিলাম। একদিকে পিঙ্গলের প্রতি আমার ভালবাসা, অপরদিকে কর্ত্তব্য। পিঙ্গলে আগুনের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছিলাম, কিন্তু অন্যদিকে কর্ত্তব্য। শেষে পিঙ্গলেকে পাঠানই স্থির হইল।

ঠিক সন্ধ্যার সময়। মা-গঙ্গার তীর, দশাশ্বমেধ ঘাটের পরের ঘাটটিতে আমরা বসিয়া আছি। মা গঙ্গা কুলকুল রবে বহিয়া যাইতেছেন। ২।৪ খানি নৌকা দেখা

---

১ বিনায়ক রাও।

যাইতেছে। মন্দির সমূহে আরতি আরম্ভ হইয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি পিঙ্গলেকে বলিলাম।

"তুমি যে কাজে যাইতেছ, তাহাতে কত বিপদ তাহা জ্ঞান বোধ হয়, একটু এধার ওধার হইলেই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে, এটা মনে ভাবিয়াছ কি ?"

পিঙ্গলে একগাল হাসিয়া বলিল, "মরা বাঁচা আমি কিছু জানি না যখন order (আদেশ) দিবেন তখন সেটা করিবই, তাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয় হবে।"

ঠিক বীরের মতনই উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু উত্তরটা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। অনেককেই হারাইয়াছি, আবার পিঙ্গলেকেও হারাইব কি ? পিঙ্গলে তার পরের রাত্রে মিরাটে গেল। পিঙ্গলের সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাৎ। এখনও তার হাসিভরা মুখখানা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে ! পিঙ্গলে তো মানুষ নয়, সে ছিল দেবতা। তার মত দশ হাজার লোক থাকিলে আজ ভারত স্বাধীন।

এটা ১৯২৪ সাল।

আজও যখন আমির চাঁদ, আবদবিহারী, বসন্তকুমার, বালমুকুন্দ, পিঙ্গলে, কর্তার সিং, মথুর সিং, জগৎ সিং, নিধান সিং, ইত্যাদির কথা মনে পড়ে, তখন নয়ন ধারায় বুক ভাসিয়া যায়। এর কারণ কি ? এরা ত আমার আত্মীয় নয়, তবে এদের জন্য এখনও কেন কাঁদি ? এরা যে আমার আত্মীয়ের চেয়েও আপনার লোক, এরা যে আমার প্রাণের ভাই। সেইজন্য এদের জন্য এখনও কাঁদি। এদের কথা মনে হইলে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইবার মতন হয়। বিপ্লবপন্থীদের মধ্যে একটা গাঢ় ভালবাসা আছে, তা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। নিজেদের বাপ, মা, ভাই, বন্ধুর চেয়েও এরা পরস্পরকে ভালবাসে। এ ভালবাসা না থাকিলে কেহ কখনও বিপ্লবপন্থী হইতে পারে না এবং বিপ্লবমূলক কার্যও করিতে পারে না।

পিঙ্গলে ধরা পড়িয়াছে সংবাদ পাইয়া শচীন এবং আর কয়েকজনের বেনারস থেকে বাংলায় গিয়া গা ঢাকা দিবার কথা স্থির হইল। ইহার ২।৪ দিন পরে সংবাদ আসিল, যে আমার আশৈশব এবং যৌবনের বন্ধু, অসাধারণ স্বার্থত্যাগী বীরকর্মী শ্রী—[২]কে হাওড়া ষ্টেশনে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন বাংলাতেই যাওয়া স্থির করিলাম। অতঃপর "বাঙ্গাল"[৩] কে সঙ্গে করিয়া আমি কাশী থেকে চন্দননগর অভিমুখে রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিলাম। চন্দননগরে খুব সকালে পৌঁছায়, এই রকম গাড়ীতে যাওয়া স্থির হইল। মগরা ষ্টেশনে পশুপতিবাবু[৪] আসিয়া অপেক্ষা করিবে। সেখানে নামিয়া পশু, বাঙ্গাল এবং আমি ত্রিবেণী থেকে নৌকা করিয়া চন্দননগরে যাইব, স্থির ছিল। বেনারস থেকে গাড়ীতে উঠিয়া, মোগলসরাই-এ চেঞ্জ করিলাম। মগরায় গাড়ীখানা ভোর ৫টার সময় পৌঁছিল। নামিতেছি, এমন সময় আমাদের

২ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। ৩ নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

৪ জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ।

জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল পশুপতি আসিয়া, ঝড়জলের জন্য নৌকা পাওয়া যায় নাই বলিয়া বরাবর চন্দননগর ষ্টেশনে গিয়াই নামা ছাড়া উপায় নাই, একথা জানাইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চন্দননগর ষ্টেশনে সদাসর্ব্বদা কতকগুলি 'টিকটিকি' (গোয়েন্দা) রাখিত কিন্তু এখন আর উপায় নাই, চন্দননগরেই নামিতে হইবে। স্থির করিলাম যে, নামিয়াই আমি প্রথমে যাইব এবং আমার পশ্চাতে ইহারা দুইজন আসিবে। চন্দনগর ষ্টেশনে নামিয়াই একটি হাত Loaded Pistolটি যেখানে আছে সেখানে রাখিয়া, অপর হাতে টিকিটখানি ধরিয়া আস্তে আস্তে 'Way out' এর দিকে আসিলাম। উড়ানিখানি অবশ্য ভাল করিয়া মাথা এবং মুখে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। একজন গোয়েন্দা সটান ষ্টেশনের বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া নাক ডাকাইতেছে। আর কেহই ষ্টেশনে নাই। টিকিট কালেক-টরটি আমার পরিচিত লোক। টিকিটখানি লইবার সময় একটু হাসিলেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বোধ হয় আমায় জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জানিলেও সে সময় তিনি কিছুই করেন নাই এবং করিতেও পারিতেন না। ষ্টেশন থেকে চলিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীর কাছেই এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। পশুপতি এ বিষয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত, একই খেলার সাথী,—এর[৫] সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। বন্ধুর বাড়ীতে সেইদিন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে একখানি গাড়ীতে বরাবর চন্দননগরের বাজারের কাছে গিয়া নামিয়া সেখান থেকে হাঁটিয়া—এর[৬] বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। সেখানে আর দুই ভায়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সমস্ত রাত কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল। এখন কি করা যায়, এই বিষয়েই আলোচনা হইল। শেষে এই স্থির করিলাম যে, ভারতের বাহিরে বিদেশে যাইব।

১৯১৪ সালেও একবার আমার বিদেশে যাইবার কথা উঠিয়াছিল। আমার বন্ধুদের মতে সেটাই আমার পক্ষে তখন শ্রেয়ঃ। সেবারে এমনকি জাহাজের টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হইয়া গেল। অধিকাংশ সময়ে আমি 'ইণ্টুইশেন' (Intuition) এর উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতাম। সেজন্য আমায় কখন কখন inconsistent হইতে হইত। একটি ছেলে সন্ধ্যার সময় ষ্টীমশিপের টিকিটখানি আনিয়া আমায় দিল। আমি তখন বাড়ীটির ছাদে বসিয়াছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু শ্রী—[২]ও আমার কাছে ছিল। আর একটি ছেলেও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। কি যেন মনে হইল। শ্রী—রদিকে[২] চাহিয়া বলিলাম—"ভাই, আমি এখন বিদেশে যাইব না, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই বলিয়া টিকিটখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। শ্রী—[২]আমার নিরাপদের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল এবং সেই উদ্বেগ ও ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বিদেশে যাইবার জন্য বুঝাইয়া ছিল এবং আমিও এরকম রাজী হইয়াছিলাম। সে সময়ে গভর্ণমেণ্ট আমাকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিতেছিল। প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে আমার ছবি (ফটো) টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল এবং আমাকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার দিবে একথাও প্রকাশ করিয়াছিল। কাজেই হৃদয়ের বন্ধু শ্রী—[২]আমার জন্য

৫ নরেশচন্দ্র সেন। ৬ মতিলাল রায়। ২ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।

চিন্তিত হইবে তা আর বেশী আশ্চর্য্যের কথা নয়। শ্রী—[২]আমার স্বভাব খুব ভাল করিয়াই জানিত। আমি যখন একবার স্থির করিয়াছি যে, বিদেশে যাইব না, তখন আমায় বুঝান বৃথা। শ্রী—[২]ও কাজেই আমার কথায় সায় দিয়াছিল।

এবারে কিন্তু আমি নিজেই বিদেশে না গেলে নয়, এই স্থির করি। তার কারণ দুইটি। একটি এই যে—আমার নিজের 'experience' এ দেখিয়াছি যে কেবল দেশীয় সেনার দ্বারা তখন আর revolution হইতে পারে না। Civiliansরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে, কখনই Successful revolution আমরা আনিতে পারিব না। লাহোরে আমাদের (অর্থাৎ Civil population) হাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সব সরঞ্জাম থাকিত, তাহা হইলে সরকার আমাদের দলের সৈনিকগণকে ধরিলেও আমরা (Civilian) বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিতে পারিতাম। আমাদের জনবল এবং disiplined organisations ছিল, কিন্তু arms ছিল না। অস্ত্র সম্বন্ধে আমরা দেশীয় সৈনিকদের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। কাজেই তাহারা যখন ধরা পড়িল তখন আমরা আর কিছুই করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে যাহাতে সৈন্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তা না পাইলেও আমরা কার্য্য করিতে পারি, সেইজন্য arms and ammunition বিদেশ থেকে না আনিলে নয়। আমার এই ইচ্ছা ছিল যে, দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পূর্ব্বে দেশটাকে Small arms দ্বারা ছাইয়া ফেলিব। সেই উদ্দেশ্যে আমি বিদেশে যাওয়া স্থির করি।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য টাকার ব্যবস্থা করা। দেশেতে সে পর্য্যন্ত এই experience অনুভব করিয়াছি যে চুরি,ডাকাতি দ্বারা বিপ্লবের টাকা কখনও যোগাড় হইবে না। তা'ছাড়া ২।৪ জন লোক ছাড়া কোন ধনীই আমাদের কাজে টাকা দিবে না। সেইজন্য বিদেশ থেকে টাকার যোগাড় করা। এই দুই উদ্দেশ্য মাথায় করিয়া আমি বিদেশ যাওয়া ঠিক করিলাম।

এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিদেশীরা কেন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা দিবে ? এ'র উত্তর এই যে, তাহাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে। যুদ্ধকালে জার্ম্মানরা ভারতীয়দিগকে টাকা এবং অস্ত্র দেয় নাই কি ? আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের এইটাই বড় রহস্যময় কথা যে, আজকের বন্ধুরা কাল পরম শত্রু হইয়া উঠেন এবং তাহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ ও আচরণ স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ইংরাজ জার্ম্মানকে তার ঘোরতম শত্রু মধ্যে গণনা করিত, আজ সেই ইংলণ্ডই আবার জার্ম্মানীর সঙ্গে মৈত্রীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ইংরাজের অনেকেই শত্রু এবং তাহার পতন দেখিবার জন্য উদগ্রীব। কাজেই তাহারা যে ভারতীয়দের সাহায্য করিবে তা আর আশ্চর্য্য কি ?

বিদেশে যাওয়া স্থির হইল, কিন্তু টাকা না হইলে ত আর যাওয়া যায় না। টাকার বন্দোবস্ত করিতে কিছু সময় লাগিবে। যোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন নিরাপদ

---

২ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, এঁ'র ছবি ও পরিচয় পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হল।

স্থানে না থাকিলেও নয়। নবদ্বীপ একটি তীর্থস্থান। অথচ সাধারণতঃ সেখানে তত বেশী লোক যাওয়া আসা করে না। কিছুদিন সেখানে থাকাই ঠিক হইল। তাছাড়া সেই সময়ে আমাদেরই একজন লোক সেখানে ছিল, তাহার মতে নবদ্বীপ খুব নিরাপদ স্থান। এই সমস্ত ঠিক করিয়া ভোর বেলা—এ'র[৬] বাড়ী থেকে 'ক' এর[৭] বাড়ীতে গেলাম। তাহার কারণ'—'[৬] একজন Suspect, তাহাব বাড়ী এবং চলাফেরা C.I.D ত 'ওয়াচ' করে। আমার পক্ষে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়।

'ক'[৭] বাড়ীতে দুপুর বেলা 'ক'র একজন আত্মীয় আসিলেন। আমি সাধারণতঃ তখন একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের মতন ছিলাম। পৈতে ত ছিলই, তার উপর একটি টিকিও ছিল। ভদ্রলোক আমি ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমায় হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রতি নমস্কার করায় বেচারী একটু ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পরে 'ক' কে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। 'ক' র কাছ থেকে একথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, "অভ্যাস কি সহজে ছাড়িতে পারি!"

তার পরদিন সকালে একটি নৌকা ভাড়া করিয়া ৬।৭ জন ভাইকে সঙ্গে করিয়া ত্রিবেণীতে গেলাম। সেখানে আহার করিয়া পশুপতি ছাড়া আর সকলকে ফিরাইয়া দিলাম। পশুপতি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই ভয়ানক দুরন্ত। পরে বরাবর আমার সঙ্গে কাজ করিয়া আসিয়াছে। ভয় কাকে বলে পশুপতি তা জানে না। ওর অভিধানে ও-কথা নেই। পশুপতি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে সদাই প্রস্তুত। পশুপতি না থাকিলে অনেক সময়েই আমায় বিপদে পড়িতে হইত। পশুপতি যেমন নির্ভিক, তেমনি বুদ্ধিমান। তাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর ট্রেনে নবদ্বীপে গিয়া হাজির। "ঠাকুর"[৮] তখন সেখানে ছিল। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য খুঁজিতে বাহির হইলাম। নবদ্বীপের একপ্রান্তে এক বৈরাগীর এক বাড়ী ছিল। ২টি ঘর। সেটি ভাড়া করিলাম। সেখানে প্রায় একমাসেরও উপর ছিলাম। বাড়ী ঠিক হইলেই 'ঠাকুর'[৮] কে সেখান থেকে টাকা যোগাড় করিবার জন্য ঢাকাতে পাঠাইয়া দিলাম। ইতিমধ্যে মারাঠী ছেলেটির আমার কাছে আসিয়া থাকা ঠিক হইল এবং পশু চন্দননগরে ফিরিয়া গেল।

মারাঠী ছেলেটি বাঙ্গলা বলিতে পারিত। কিন্তু কখন কখন উচ্চারণ ঠিক হইত না, কাজেই বাজার করিবার জন্য বাড়ীর মালিক বৈরাগী মহাশয়ের আশ্রয় লইতে হইল। বৈরাগীকে একদিন মাছ কিনিয়া আনিবার জন্য বলায় সে ইহাতে রাজী নয়, ২।৪ বার অনুরোধ করার পর রাজী হইল, তারপর প্রত্যেক দিন গামছা করিয়া মাছ কিনিয়া আনিত। একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। মাছের ঝোল অম্লান বদনে খাইয়া গেলেন। অথচ ইনি প্রথমে মাছ কিনিয়া আনিতে রাজী হন নাই, কারণ তিনি বৈরাগী এবং মাছ ছোঁন না। এই ঘটনাতে আমাদের সমাজের অবস্থা বেশ বোঝা যায়।

৬ মতিলাল রায়। ৭ সাগরকালী ঘোষ।

৮ ত্রৈলোক্য মহারাজ।

আমাদের নবদ্বীপ বাসের সময় অনেক ভায়েরাই আমার কাছে যাতায়াত করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রতাপ সিংহের কথাই এখানে একটু বলিব। প্রতাপের ঠাকুরদাদা, বাপ, খুড়ো সকলেই দেশের জন্য আত্মদান করিয়াছে, প্রতাপের সঙ্গে আমার অনেক পুরাতন সম্পর্ক। পণ্ডিত অর্জ্জুনলাল শেঠীজির recommendation লইয়া প্রতাপ, ওর ভগ্নীপতি এবং আরও দুইটি ছেলে দেশ সেবা করিবার জন্য দিল্লীতে মাষ্টার আমীর চাঁদজীর কাছে ১৯১৩ সালে আসিয়াছিল। আমি বাড়ীতে গেলে তিনি হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বাবুজি, আপকে লিয়ে ৪ বড়ে দেশপ্রেমিক ম্যায় ইঁহা লেয়ায়া হায়"—"বাবুজি আপনার জন্য ৪ জন খুব দেশভক্তকে এখানে আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।" শ্রীআমির চাঁদজীর বাড়ীর কাছেই একটি ভাড়াটে বাড়ীতে এদের রাখা হইয়াছিল। আমি সেদিন দিল্লীতে আসিব একথা এরা জানিত বলিয়া আমার জন্য ভাল করিয়া রাজপুতানার ঢঙে রুটী এবং তরকারী করিয়া রাখিয়াছিল। বেলা ১১টার সময় সেই ভাড়াটে বাড়ীতে আমি এবং মাষ্টারজী দুইজনে গেলাম। আবদ বিহারীকে একটা গুরুতর কাজ দিয়াছিলাম বলিয়া সে আসিতে পারিল না। সেখানে প্রতাপের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। চোখের দিকে চাহিয়া দেখি, যেন আগুন ঠিকরাইতেছে। প্রতাপ সিং প্রকৃতই সিংহ ছিল।

পশুপতি সংবাদ আনিল যে, প্রতাপ রাজপুতানা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আসিয়া চন্দননগরে অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য পশুপতিকে বলিলাম। তার পরদিন পশুপতি প্রতাপকে সঙ্গে করিয়া আনিল। প্রতাপকে বুঝাইলাম যে, কেন আমি বিদেশে যাইতেছি। সমস্ত শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমাকে সে অনেকদিন দেখিতে পাইবে না, এইটা তার প্রাণে বড় বাজিল। সেই প্রতাপের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। প্রতাপ আর ইহজগতে নাই। জেলেতেই প্রতাপ পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। যেখানকার জিনিস সেই-খানেই চলিয়া গিয়াছে।

'ঠাকুর' ঢাকায় গিয়া গিরিজাবাবুকে আমার কাছে পাঠাইল। গিরিজাবাবু এবং শচীন ও পশুপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চন্দননগর হইয়া কলিকাতায় যাওয়া ঠিক হইল। পশুপতিকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ থেকে বরাবর আসিয়া চুঁচুড়া ষ্টেশনে নামিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া চন্দননগরের সীমান্তে আসিলাম। সেখান থেকে হাঁটিয়া—[৬]এ'র বাড়ীতে আসিলাম।—[৬]এ'র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরের দিন সন্ধ্যার সময় শচীন এবং স্নেহের গিরিজাকে সঙ্গে করিয়া 'ক'[৭] এর নৌকাতে গঙ্গা পার হইয়া কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম, গিরিজাবাবুর পরিচিত এক বন্ধুর বাসায় উঠিলাম।

গিরিজাবাবুর সঙ্গে আমার বেশী দিনের পরিচয় নয়। কিন্তু ২।৪ দিন আলাপ করিয়াই দেখিলাম যে তাঁর মতন মানুষ কম। তাঁর মতন স্বার্থত্যাগী দেশভক্ত লোক

---

৬ মতিলাল রায়। ৭ সাগরকালী ঘোষ।

সহজে পাওয়া যায় না। আমার কপাল অনেক ভাল বলিয়াই গিরিজাবাবুর (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) মতন লোক পাইয়াছিলাম। সে গিরিজাবাবু আর ইহজগতে নাই।

কিরূপে ভারত ত্যাগ করিলাম?

এখন প্রথম কাজ হইল ষ্টীমার ঠিক করা এবং টিকিট কেনা। সেই সময়ে সংবাদ-পত্রে দেখিলাম যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই খবর পড়িয়াই মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল। শচীকে বলিলাম যে পি. এন. টেগোর এই নামে একখানি জাপানের টিকিট কেন। দেরাদুনে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের একটি Villa আছে। সেখানে থাকার সময় ইহার নাম শুনিয়াছিলাম। Poet Tagore এর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এই ভাবে পরিচয় দিলে ইংরেজ হঠাৎ সন্দেহ করিতে পারিবে না। কারণ কবি তখন জাপান যাইবেন এই কথা সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। ইংরেজ মনে করিবে, ঠাকুর নিজে জাপান যাইবেন বলিয়া হয়ত একটু আগে জাপানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি যেমন ভাবিয়াছিলাম, হইলও ঠিক তাই।

শচীন কলিকাতা হইতে কোবে যাইবার একখানি টিকিট কিনিয়া আনিল। ইতি-মধ্যে গিরিজাবাবু ২টা সাহেবী সুট খরিদ করিয়া আনিলেন। ষ্টীমার ছাড়িতে তখনও কিছুদিন দেরী আছে। দুইদিন বাদে ২।৪টি ছেলেকে ডাকাইয়া, আমার অবর্তমানে তাহাদের সকলকে শচীন এবং গিরিজাবাবুর অধীনে কার্য করিবার জন্য বলিলাম। ইহার দুইদিন পরেই জাহাজ ছাড়িবার দিন।

১৯১৫ সালের মে মাস। ১২ তারিখ। এই দিন ষ্টীমার ছাড়িবে। খুব সকালে উঠিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া 'ম'[৬] কে একখানি চিঠি লিখিলাম। অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। "স্নেহের ভাই, আমি চলিলাম, তোমার সংসার তুমি দেখ"—এই কথাগুলি লিখিয়াছিলাম। পশুপতি[৪] আমার সুখ দুঃখের সহচর। পশুপতিকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইয়া তাহার মারফৎ পত্রখানি 'ম'র[৬] কাছে পাঠাইলাম।

ভাবনাতে মনটা একেবারে আকুল। তখন পর্যন্ত ভারতের বাহিরে যাই নাই। পাঁচ বছর পূর্বে অবশ্য একবার বর্মায় গিয়াছিলাম। কিন্তু বর্মাটা ভারতের বাহিরে বলিয়া মনে হয় নাই। এইবারই আমার প্রকৃত দেশের বাহিরে যাইতে হইবে। বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সব ছাড়িয়া কোথায় এক অপরিচিত স্থানে অজ্ঞাত লোকের মধ্যে চলিলাম, এই ভাবনাটায় বড়ই অস্থির হইলাম। সকলের চেয়ে দেশটাকেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। কর্তব্য

৪ জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, এঁর ছবি ও পরিচয় পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হয়েছে।

৬ মতিলাল রায়।

সম্মুখে, পালন করিতেই হইবে। একবার দুর্বলতা আসিয়া বলিল, "তুমি বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া বিদেশে যাইওনা।" পরমুহূর্তেই আমি এটা যে আমার দুর্বলতার স্বর, বুঝিয়া মনকে দৃঢ় করিলাম।

১২টা বাজিলে আস্তে আস্তে পোষাক পরিয়া একটার সময়ে দুখানি ফার্ষ্ট ক্লাস ঘোড়ার গাড়ী ডাকিবার জন্য বলিলাম। গাড়ী দুইখানি আসিলে একটিতে গিরিজা-বাবু এবং অপরটিতে আমি এবং শচীন উঠিয়া বসিলাম।

গাড়ী দুইখানি গড়ের মাঠের ধার দিয়া খিদিরপুরের দিকে যাইতে লাগিল। তখন মনের অবস্থা ভীষণ। ছেলেবেলার কথা, যৌবনের কথা, বাপ, মা ভাই, বন্ধু, খেলার সাথীদের কথা একে একে প্রাণে উদয় হইল। প্রাণটা যেন বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। চক্ষের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। শচীকে জড়াইয়া ধরিয়া, "ভাই আমি দেশ ছাড়িলাম, খুব সাবধানে থাকিয়া কার্য্য করিও"—এই কথাগুলি বলিলাম।

আমি যে ষ্টীমারে চড়িব—তাহার নাম "সানুকি মারু" (Sanukimaru)—নিপ্পন য়ুসেন কোম্পানীর জাহাজ, ৭৫০০ টন। "সানুকি" জাপানের একটি সহরের নাম। 'মারু' এই শব্দের অর্থ গোল। ইংরাজিতে যেমন জাহাজের নামের পূর্বে S S. অর্থাৎ Steamship এই কথা লেখা থাকে, জাপানে তেমনি জাহাজের নামের পরে মারু শব্দ লেখা থাকে। যে জাহাজের নামের সঙ্গে "মারু" এই কথাটি আছে, সেটি জাপানী জাহাজ তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়।

"সানুকি মারু" ছয় নম্বর খিদিরপুরে ডকে ছিল। ছয় নম্বর ডকের ফটকে পৌঁছিবার দুই মিনিট পূর্বেই শচীন আমার গাড়ী হইতে নামিয়া যায়। সেই সময়ে গিরিরাজবাবুও তাঁর গাড়ীখানি ফিরাইয়া দিলেন। রহিল কেবল আমার গাড়ী এবং আমি তাহাতে একেলা। শচীন এবং গিরিজাবাবু একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমার জাহাজে নিরাপদে চড়াটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল।

আমাদের বাসা হইতে গাড়ী করিয়া আসিবার সময়, আমার কাছে এ পর্য্যন্ত সদা সর্বদা রাত্রে শুইবার সময়েও যে গুলিভরা "মসার" পিস্তলটা ছিল, তাহা শচীকে দিয়া আসি। গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখি, শচী এবং গিরিজাবাবু দুজনেই এক একটা পিস্তল লইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পিস্তল লইয়াছ কেন?" শচী এবং গিরিজাবাবু উত্তর দিল—"যদি কোনও গোলযোগ হয়, তাহলে পিস্তল দুটি থাকলে আপনাকে রক্ষা করতে পারব।"

শচী এবং গিরিজাবাবু আমায় কত ভালবাসিত এই ঘটনার উল্লেখে তার পরিচয় দিলাম। নিজেদের বিপদে ফেলিয়াও আমায় রক্ষা করিবার জন্য ইহারা সদাই প্রস্তুত।

আমি বলিলাম, "বাপু যদি পুলিশ জানিতেই পারে তাহলে দুটা পিস্তলে আর কি হবে? আমার জীবনের চেয়ে পিস্তল দুটির আবশ্যক বেশী ও দুটি কোন জায়গায় রেখে যাও।"

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের নিষ্ফলতার একটি প্রধান কারণ যে, আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র ছিল না। আমি তখন আমার জীবনের চেয়ে পিস্তল দুটির বেশী দাম বলিয়াই জানিতাম। তা ছাড়া, পিস্তল ব্যবহার না করিলে হয়ত কেবলমাত্র আমি একলাই ধরা পড়িব। কিন্তু আমায় রক্ষা করিতে গিয়া ইহারা যদি পিস্তল চালায় তাহা হইলে আমার সঙ্গে ইহারাও ধরা পড়িবে। সেই কারণে পিস্তল লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই বলিয়া অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু দুইজনেই গোঁ ধরিল, যে পিস্তল না লইয়া গেলে আমাকে মৃত্যুর মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অনেক বলাতেও যখন রাজী হইল না, তখন আর কি করি? উহারা পিস্তল দুটি লইয়াই চলিল।

৬নং খিদিরপুর ডকে আমার গাড়ীখানা আসিয়া পেঁীছিল। তখন বেলা ২টা। দ্বাররক্ষক বলিল, যে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। গাড়ীতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম পর, "সানুকি মারু" হইতে একজন জাপানী কর্মচারী আসিয়া আমাদের জাহাজে চড়িবার জন্য বলিল। আমার গাড়ী ঠিক জাহাজের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আমি জাহাজে উঠিয়া নিজের কেবিনে আশ্রয় লইলাম। গাড়োয়ান আমার তোরঙ্গ মাথায় করিয়া কেবিনে আনিল।

কেবিনে আর ভারতীয় কেহই নাই। একটু হিন্দুস্থানী জানা একজন জাপানী এবং দুইজন ইউরেশিয়ান। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীর 'without food.' গাড়োয়ানকে ভাড়া এবং বকশীস দিয়া Purser এর কাছে যাইলাম। তিনি বেশ ইংরাজী জানেন। রাস্তায় খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম যে Steward' এর সঙ্গে কোনও রকম বন্দোবস্ত হইতে পারে কিনা। তিনি Steward কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। Steward আসিয়া বলিল, যে খাবার জন্য প্রত্যেক দিন সাড়ে তিন টাকা খরচ পড়িবে। ভাবিয়া দেখিলাম যে কোবেতে পেঁীছিতে একমাস লাগে, তা'হলে খাবার জন্যই আমার একশত টাকার বেশী লাগিবে। অথচ "with food" প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দাম মোট ২১২৲—কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটখানি (এটি ৮০ টাকায় খরিদ করিয়াছিলাম) সহ আহার্য্য প্রথম শ্রেণী করিয়া বদল করিলাম। তারপর নিজের তোরঙ্গটি প্রথম শ্রেণীর কেবিনে আনাইলাম।

এ জাহাজখানা প্যাসেঞ্জার বোট নয়। আধা লোকযাত্রী ও আধা মালবাহী জাহাজ, সেইজন্য বেশী কেবিন ছিল না। প্রথম শ্রেণীতে কেবলমাত্র তিনটি কামরা। একটিতে দুইজন জাপানী, একটিতে একজন জু মেয়ে এবং তৃতীয়টিতে আমি আর একজন সুরাটবাসী মুসলমান। তিনি কোবেতে একজন ভারতবাসীর দোকানের চাকর। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ নীচের ডেকে যাত্রীদের অধিকাংশই শিখ এবং দুইজন সীমান্ত পারের (Trans-Frontier) পাঠান ছিল। শিখেরা সব চায়না যাইতেছে, আর পাঠান দুটি জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইবে। সিঙ্গাপুর যাত্রীও ৭।৮ জন up-countryর লোক ছিল।

Purser কে আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে আমি একজন ছাত্র, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছি। আমার নাম 'Tagore' দেখিয়া সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে রবিবাবুর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। আমি বলিলাম যে দূর সম্পর্ক আছে তবে একই বংশ, এখন আলাদা আলাদা আছে। আমি যে ঠাকুর বংশের লোক এটা জানিয়া Puser খুব আনন্দিত। Dr. Tagore সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিল এবং আমি যথাযথ তার উত্তর দিলাম। তারপর আমি যে ছাত্র ও জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য যাইতেছি, এটা জানিয়া আমাকে জাপানের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল। শেষে জাপান যে ভারতের মিত্র এবং ভারতকে স্বাধীন দেখিলে জাপান যে খুব আনন্দিত হইবে, তাহা বুঝাইল।

নিজের কেবিনে তোরঙ্গ রাখিয়া আসিয়া ডাইনিং রুমের সামনে ডেকের উপর পায়চারী করিতেছি, এমন সময় দেখি যে শচী দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ইসারা করিয়া বলিলাম, যে সমস্ত মঙ্গল এবং সে বাসায় ফিরিয়া যাউক। আমার ইসারা বুঝিয়া শচী আস্তে আস্তে ফটকের দিকে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে শচী তখনও অপর দিকে দাঁড়াইয়া আছে। শচী যে আমার জন্য কত উদ্বিগ্ন তা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু তবু আমি ইসারা করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিলাম।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এই কথা শুনা গেল। আমি ডেকে একটা আমার কেদারার উপরে বসিলাম। ডাক্তার একজন বাঙ্গালী, কোট প্যাণ্ট পরিয়া হ্যাট মাথায় ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তৎক্ষণাৎ Captain এবং Purser তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ডাইনিং রুমে লইয়া গিয়া ২।১টী হুইস্কি পেগ খাওয়াইলেন। তারপর Passenger list তাঁহাকে দেওয়া হইল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের তিনি আর দেখিলেন না। সাধারণতঃ সব স্থানেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ডাক্তারেরা পরীক্ষা করেন না। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র দেখে। আমাদের বেলায়ও তাহাই হইল। ভাবিলাম, যাক একটা বিপদ কাটিল। তারপর তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দেখিলেন। তৃতীয় শেণীর আরোহীদের মধ্যে দুজনের ছোঁয়াচে রোগ ছিল বলিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল।

ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইবার পর, পুলিশ আসিয়া হাজির। দুইজন সাহেব এবং দশজন দেশীয় কনষ্টেবল। ভাবিলাম ব্যাপার গু রু ত র! অত পুলিশ কেন আসিতেছে? জাহাজে পুলিশের কি কাজ আছে? তবে কি উহারা খবর পাইয়াছে যে আমি এখানে আছি? দিনের বেলায় এত লোকের মধ্যে হইতে পালান সম্ভব নয়। এই রকম ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি যে কেবল মাত্র একজন সাহেব পুলিশ অফিসার আমাদের অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কেবিনের দিকে আসিতেছে এবং অপর সকলে নীচে অপেক্ষা করিতেছে। সে ডেক দিয়া সোজা ডাইনিং রুমে গেল। আমি ঠিক ডাইনিং রুমের সামনে ডেকে আরাম কেদারায় বসিয়া আছি এবং সে সময় একটী 'Englishman' সংবাদপত্র পড়িতেছি, অর্থাৎ পড়িবার ভান করিতেছি।

সাহেবটি ডাইনিংরুমে আসিলেই Captain এবং Purser তাহাকে পূর্বের ডাক্তারের মতন হুইস্কি সিগার ইত্যাদি দিয়া অভ্যর্থনা করিল। তারপর তাহাকে যাত্রীদের একটা তালিকা দিল। প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের মধ্যে আমি এবং আর একজন ভারতবাসী। আমাদের সম্বন্ধে Purserকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে একজন বণিক এবং অপরটি অর্থাৎ (আমি) Tagore familyর লোক, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছে। সাহেব এতেই একেবারে সন্তুষ্ট। আর কোনও কথা না বলিয়া Purserকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে গিয়া প্যাসেঞ্জারদের দেখিয়া পরে ডেক যাত্রীদের পরীক্ষা আরম্ভ করিল। নাম, ধাম, কোথায় যাইবে ইত্যাদি অনেক রকমের জেরা চলিল। তাহার ফলে এই হইল, যে দশ জন শিখকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল এবং দুইজনকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল।

পুলিশ চলিয়া গেলে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া খাবারের ঘরে গেলাম। কাপ্তেনকে দেখিয়া জাহাজ কখন ছাড়িবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, রাত ১১টার সময়। জাহাজটি কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হইলেই নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু আরও ৭ ঘণ্টা এখানে থাকিতে হইবে। উপায় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই খাবার ঘণ্টা বাজিল। ঠিক কাপ্তেনের দক্ষিণ পার্শ্বে আমার স্থান, তারপর Purser তারপর আমার কেবিনের ভদ্রলোকটি, তারপর Petty officers, কাপ্তেনের বাম ভাগে বড় ইঞ্জিনিয়ার, তার পার্শ্বে জাপানী যাত্রী দুটি, তারপর জু মেয়েটি, তারপর ডাক্তার এবং পেটি অফিসারেরা। অর্থাৎ আমাকে কাপ্তেনের দক্ষিণ দিকের প্রথমে বসাইয়া সম্মানের জায়গাটা দিয়াছিল। Menuতে দেখি ১০/১২ টা course, সব বিলাতী ডিস, এত খাওয়া অভ্যাস নাই. খাইতে পারিব না। মাঝখানে দেখি Rice curry লেখা আছে। ছেলেবেলা অবধি এটা খাইতেছি, কাজেও এটাও তালিকার মধ্যে আছে জানিয়া খুব খুসী। 'বয়'কে বলিলাম, দেখ অন্য ডিসগুলি আমার দরকার নাই তুমি আমায় ভাত তরকারী যথেষ্ট পরিমাণে আনিয়া দাও। সে তাই করিল। সেইদিন অবধি সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা তিন বারই আমায় ভাত-তরকারী দিত। জাহাজে আমাদের ৫ বার খাইতে হইত। সকালে টোষ্ট এবং কফি বা চা। ৯টার সময় regular খাবার (Break fast) ১টার সময় আবার regular খেঁট, (Lunch) ৩টার সময় বিস্কুট, কেক্ ও চা, ৫টার সময় regular খাবার (dinner)। ৯, ১ এবং ৫টার সময় প্রায় ১২টা করিয়া জিনিস দিত।

Dinner শেষ করিয়া ডেকে একটু পায়চারি করিবার পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন নিজের কেবিনে সাহেবী পোষাকটা ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিনের উদ্বেগ চাঞ্চল্যে শরীরটা একটু ক্লান্ত হইয়াছিল। শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন রাত্রি ১১ টা। বোধ হইল জাহাজখানা একটু নড়িতেছে। দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখি যে জাহাজ নঙ্গর

উঠাইতেছে। নঙ্গর উঠান হইলে জাহাজখানা আস্তে আস্তে গঙ্গার মধ্যে আসিয়া সাগরের অভিমুখে চলিল। ক্রমশঃ কলিকাতা অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, কেবল তাহার Electric এবং Gas light দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপে আমি আমার বড় সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলাম। অন্ধকার ডেকের উপর একলা দাঁড়াইয়া খুব কান্না পাইল।

পিনাং অভিমুখে

কিছুক্ষণ পরে নিজের (berth) বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। সকাল হইলে উঠিয়া দেখি, জাহাজখানা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাপার কি, রাত্রির ঘটনাটা কি স্বপ্ন ? তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডেকে আসিয়া দেখি যে বাস্তবিকই জাহাজটা দাঁড়াইয়া আছে। তবে খিদিরপুর ডকে নয়, গার্ডেন রিচ-এ ঠিক ক্লাইব মিলের সামনে। গঙ্গায় ভাটা বলিয়া জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে, জোয়ার আসিলেই নঙ্গর উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে।

"নি" এই জায়গার সামনেই থাকিত। তার কথা হঠাৎ মনে পড়িল। একবার ভাবিলাম, না, "নি"র মত বন্ধুবান্ধবকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইব না। জাহাজ হইতে নামিয়া সাঁতার দিয়া "নি"র কাছে যাই। প্রাণটা বড়ই খারাপ হইল। কি করা উচিত এই বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ জাহাজটা খুব জোরে whistle দিয়া ছাড়িয়া দিল। তখন বেলা ৭টা। ভাবিলাম, বিদেশে যাওয়াই দেখিতেছি ভগবানের ইচ্ছা।

অনেক দিনের একটা পুরান কথা মনে পড়িল, তখন আমি মর্টন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। সে সময়ে আমি যে রাস্তায় থাকিতাম, সেই রাস্তায় একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে একজন সাধু আসিয়াছিলেন। সাধু ভূত এবং ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন শুনিয়া আমি এবং আমার এক সহপাঠী সাধুর কাছে যাই। সাধুর অনেক বয়স হইয়াছে। প্রথমে আমার বন্ধু প্রশ্ন করিল ; সাধু তাহার জবাব দিয়া বলিলেন যে, আমার বন্ধুর পরমায়ু খুব কম। তারপর আমি প্রশ্ন করিলাম। সাধু বলিলেন যে, আমার দূর বিদেশে যাইতে হইবে। এই ঘটনার ৪।৫ মাস পরে আমার বন্ধুটি কলেরা রোগে মারা যায়। সেই সময় হইতে আমার একটা ধারণা ছিল যে, আমায় বিদেশে যাইতে হইবে। ঘটনাস্রোতও এরকম হইল যে শেষে আমায় বিদেশেই যাইতে হইল।

জাহাজটা ৭ টার সময় ছাড়িয়া পুনরায় রাত্রি ১টার সময় থামিল। তার পরদিন অর্থাৎ ১৪ই মে ১৯১৫ সকালে ৮ টার সময় পুনরায় ছাড়িল। বেলা ৪টার সময় Pilot নামিয়া pilotship এ গেল। তখন জাপানী ক্যাপ্টেন জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। সকল জাহাজই সমুদ্রে ক্যাপ্টেন এর দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু বন্দরে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই বন্দরের pilot জাহাজকে বন্দরে লইয়া যায়। বন্দর হইতে বাহির হইবার সময়েও এই নিয়ম। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে

সেখানে একটি জাহাজ নঙ্গর করা আছে, সেইটি Pilotship Pilot সেখানে থাকে এবং কলিকাতায় যে সমস্ত জাহাজ আসে তা' দিকে সেখান হইতে চালাইয়া লইয়া' আসে। সেই সময়ে আমি যে Diary লিখিয়াছিলাম, তাহার একটি অবিকল নকল এখানে দিলাম ঃ—

"14th May 1916 : Pilot got down at 4 P.M. Here was a clear division of the sea water and Ganges water. A line is clearly drawn between blue and reddish water. Evening witnessed a very rough sea Rain and storm. Waves rising after waves and dashing against one another, sometimes thereby forming big craters. Dark blue sea. Felt sea sickness. Boat terribly rolling."

এইদিন প্রথমে sea-sickness বা সমুদ্রপীড়া অনুভব করিলাম। রাত্রিতে dinner খাইয়া তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় ১২টার সময়ে জাহাজের বাঁশীর শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাঁচ মিনিট অন্তর জাহাজ বাঁশী দিতেছে। কারণ কি জানিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া ডেকে গিয়ো দেখি চারিদিক অন্ধকার। এত অন্ধকার এবং কুয়াসা যে দশ গজ দূরে কি আছে দেখা যায় না। ডেকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছি, এমন সময় একজন অফিসার ব্রিজ হইতে নামিয়া আসিলেন। ব্রিজ—জাহাজের সব চেয়ে উঁচু যায়গা যেখান হইতে ক্যাপ্টেন এবং অফিসাররা জাহাজ চালায়। ঘন ঘন বংশী ধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, কুয়াশার জন্য বাঁশী দেওয়া হইতেছে ; ইহার উদ্দেশ্য, আর কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা না লাগে, কুয়াশার জন্য অন্য জাহাজ দেখিতে না পাইলেও,যদি অন্য জাহাজ কাছে থাকে, তাহা হইলে আমাদের জাহাজের বাঁশী শুনিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিবে। তাঁর মুখে বাঁশী দিবার কারণ শুনিয়া পুনরায় নিজের কেবিনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমি প্রত্যেক দিনই খুব সকালে উঠিতাম। পরের দিন (১৫ই মে ১৯১৫) ৫টার সময় উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া টোষ্টরুটি ও কফি আনাইয়া খাইলাম। ৬, ৭, ৮টা বাজিল, ডেকে কাহাকেও দেখা গেল না, ছোট হাজরীর ঘণ্টা বাজিল। জাহাজের কর্মচারীরা এবং আমি ছাড়া আর কোন লোকই ডেকে নাই, আমার ঘরে যে মুসলমানটি থাকিতেন, তাহাকে ডাকিলাম।

কোনও রকমে ভদ্রলোক মাথাটা একটু তুলিয়া বলিলেন "বাবুজী মৈ নেহি উঠ সক্তে হেঁ। Sea-sickness সে মৈ মর রঁহে হাঁয়।"

আমি বলিলাম, কিছু খান, না খাইলে Sea-Sickness এ আরও কষ্ট পাইবেন।

একবার তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলাম, কিন্তু তিনি বসিতে পারেন না। উপায় নাই দেখিয়া boyকে ডাকিয়া তাঁহার খাবার তাঁহার বিছানার কাছে রাখিবার জন্য বলিয়া আমি জাহাজের খাবার ঘরে খাইতে গেলাম, তখন সমুদ্রে ভয়ানক ঢেউ।

ঝড় জল খুব হইতেছে, একবার একটা বড় রকমের ঢেউ আসিয়া আমাদের খাবার ঘরের দরজার উপর পড়িল। তার ধাক্কায় দরজাটা খুলিয়া গেল এবং ঠিক দরজার সামনে বসিয়াছিলেন ক্যাপ্টেন বেচারী, তাঁর কাপড়-চোপড় সমস্ত ভিজিয়া গেল। আমারও প্যান্টটা একটু ভিজিয়া গেল।

ক্যাপ্টেন আমায় বলিলেন, "কেমন দেখছেন ? sea-sickness এখন কেমন, খুব পেট ভরে খান, তা হলে sea-sickness তত হবে না।" খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ডেকে একটু পায়চারি করিবার জন্য বাহির হইলাম। কিন্তু জাহাজ এত দুলিতেছিল যে ডেকে দাঁড়ানই অসম্ভব। কোনও রকমে মাতালের মত টলিতে টলিতে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া ডেকে কিংবা খাইবার ঘরে কোনও লোককে দেখিতে পাই নাই তাহার কারণ সকলেই sea-sickness এর দরুণ বিছানা হইতে উঠিতে পারে নাই।

আমি বিছানায় বসিয়া গীতাখানি পড়িতে লাগিলাম। শেষে আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িলাম, কিছুক্ষণ ঘুমাইবার পর মাথাটা একটু যেন পরিষ্কার হইল। ইতিমধ্যে lunch-এর ঘণ্টা বাজিল, কোনও রকমে খাবার জায়গায় গিয়া বসিলাম।

প্রথমে খুব পেট ভরিয়া খাইব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু plateর অর্দ্ধেক rice-curry খাইবার পর আর খাইতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে উঠিয়া পুনরায় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। বৈকালে চা আর খাইবার ইচ্ছা হইল না। dinner-এর সময় জোর করিয়া উঠিয়া কোনও রকমে টেবিলে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে সময় একটু খাইতেও পারিলাম। খাইয়াই বিছানায় গিয়া শয়ন।

১৬ই মে ১৯১৫ সকালে উঠিয়া দেখি যে জল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঝড় তখনও আছে এবং জাহাজ পূর্বের মত দুলিতেছে। Boy কে বলিয়া bath তৈয়ারী করাইয়া নাহিলাম। তাহাতে শরীরটা অনেক সুস্থ হইল। Sea sickness টা অনেকটা কমিয়া গেল। ধীরে ধীরে আমাদের ডেক হইতে নামিয়া তৃতীয়-শ্রেণীর ডেক-এ গেলাম।

শিখ এবং পাঠানদের সঙ্গে আলাপ সুরু করিলাম। বাবুজী, আপনি কোথায় যাইবেন এবং কি করেন। এই তাহাদের প্রথম প্রশ্ন! আমি বলিলাম যে বাপু, আমি একজন ছাত্র, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছি। আমাকে পাইয়া তাহারা মহাখুশী। কারণ, তাহারা কেহই ইংরাজী না জানায় জাহাজের কর্মচারীদের সঙ্গে আবশ্যকীয় কথাবার্তা বলিতে পারিতনা। সেই দিন হইতে আমি তাহাদের manager-ই বল, আর interpreter-ই বলি হইলাম। তাহাদের সঙ্গে দেশ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল।

যে দুইজন পাঠান ছিল, তাহারা বলিল, কলিকাতায় আসিবার সময় তাহারা মৌলানা সৌকত আলির সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিল এবং তাহারাও

ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য 'জান' দিবে এ কথাও বলিল। পাঞ্জাবের বিদ্রোহ চেষ্টা যে নিষ্ফল হইয়াছে, এসব কথা তাহারা জানিত এবং পাঠানদের মধ্যে একজন বলিল "রাসবিহারী আব কাবুল মে হ্যায়" (রাসবিহারী এখন কাবুলে)।

তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া নিজের কেবিনে বসিয়া আছি, এখন সময় দেখি দুইজন শিখ আমার কেবিনের জানালা (অর্থাৎ একটি গোল ছিদ্র) হইতে আমায় নমস্কার করিতেছে। কি চাও, জানলার কেন, দরজা দিয়া আমার ঘরে এস, এই কথা বলিলাম। তাহারা প্রথম শ্রেণীর খাইবার ঘরের ভিতর দিয়া আসিতে সাহস পাইতেছেনা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আমার কেবিনে আনিলাম। চেয়ারে বসিবার জন্য বলিলাম, কিন্তু বসিতে চাহেনা। তখন তাহাদের এক বক্তৃতা দিয়া ইহা বুঝাইলাম যে, আমি তাহাদের ছোট ভাই—এবং তাহারা আমার বড়ভাই। অনেক বুঝাইয়া তাহাদের বসাইলাম।

ইতিমধ্যে একজন একটি পুঁটুলি বাহির করিয়া আমার সামনে রাখিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এর ভিতর কি আছে। তাহারা বলিল, বাবুজির জন্য আমরা রুটি এবং ডাল তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছি জাহাজের খাবারে বাবুজির কষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া রুটি এবং ডাল আনিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া আমার চোখ দিয়া জল বাহির হইল—চেনা পরিচয় নাই, এক প্রদেশের লোকও নই, অথচ পাছে আমার কষ্ট হয় এজন্য আমার জন্য এই সমস্ত খাবার লইয়া আসিয়াছে।

যাদের সাধারণতঃ ইংরাজি-জানা বাবুরা uneducated বলেন, আমার মতে তারাই educated, চিরস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে—স্বামীজি education-এর definition এই রকম দিয়াছিলেন, Education is the manifestation of perfection already in man, হৃদয়ের education-ই প্রধান education, এবং এ বিষয়ে দুনিয়ার লোকের চেয়ে আমাদের দেশের লোক অনেক উচ্চে। বঙ্গে আসিয়া এই রকম ডাল রুটি খাই নাই, কাজেই বড় মিষ্ট লাগিল। সেই দিন হইতে তাহারা প্রত্যেকদিনই একবার করিয়া আমায় ডাল রুটি খাওয়াইত এবং অতি তৃপ্তির সহিত আমি তাহা খাইতাম।

বৈকালে ক্যাপ্টেনের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন, আজ রাত্রিতে আমরা আন্দামান pass করিব।

আন্দামান কথাটা খুবই পরিচিত, কাজেই ক্যাপ্টেনকে বলিলাম, রাত্রিতে আন্দামান দ্বীপ দেখিতে চাই। তিনি রাত্রিতে ব্রিজের উপরে তাঁহার ঘরে যাইবার জন্য বলিলেন। রাত্রিতে তাঁহার ঘরে যাইলে তিনি chart দেখাইয়া হিসাব করিয়া আমরা আন্দামান হইতে কতদূরে দিয়া যাইতেছি তাহা বুঝাইয়া দিলেন। দূরে একটি আলো দেখা গেল; ক্যাপ্টেন বলিলেন, ওইটাই আন্দামান।

কথাটা শুনিয়া বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল এবং মনে হইল, কত ভাই যে আমার এখানে পচিয়া মরিতেছে—দেশের সেবার জন্য গ্যারিবল্ডি ওয়াশিংটন প্রভৃতি যে কাজ করিয়াছিলেন ইহারা ত সেই কাজই করিয়াছিল !

ক্যাপ্টেনের ঘর হইতে নামিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। আন্দামানের কথাটা কেবলই মনে হইতে লাগিল, এবং অন্তরে অনেক চিন্তারই উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৭ই মে ১৯১৫, এদিন পুনরায় জল আরম্ভ হইল এবং ঝড়টাও প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। সমুদ্রে খুবই ঢেউ, জাহাজটাও খুব দুলিতে লাগিল। এইভাবে ১৮ই মে-টাও কাটাইলাম। ১৯শে মে সকালে উঠিয়া দেখি যে, জলঝড় থামিয়া গিয়াছে, সমুদ্র স্থির। বেলা ২টার সময় কুল দেখা গেল।

রাত্রি এগারটার সময় পিনাং বন্দরের বাহিরে পিনাং Light house-এর কাছে আসিয়া আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিল। Sea-sickness সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে একজন জাপানী মহিলা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটে জাপানে যাইতেছিলেন। ১৪ই মে তাঁহার Sea sickness হইয়াছিল, সেইদিন হইতে ১৯শে তারিখ পর্যন্ত একবিন্দু জলও ব্যাচারী খাইতে পারেন নাই। ঔষধ কোনও রকমে খাওয়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিতেন। ১৮ই তারিখে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার চিন্তা হইল।

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রাণের আশঙ্কা আছে কি?" ডাক্তার বলিলেন, "ভাবিবেন না, কাল অর্থাৎ ১৯শে তারিখে জাহাজ পিনাং পেঁাছিলেই উনি উঠিয়া বসিবেন।"

ঠিক হইলও তাই। ২০শে তারিখের সকালে দেখি যে জাপানী মহিলাটি উঠিয়া ডেকের উপর ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছেন। জাহাজ নঙ্গর করিবার পর হইতেই তিনি খাইতে পারিলেন এবং এক রাত্রি ঘুমাইবার পরে ভাল হইয়া উঠিলেন।

পিনাং বন্দরে

২০ শে মে খুব সকালে Pilot, Port officer, ডাক্তার এবং একজন পুলিশ কর্মচারী আমাদের জাহাজে আসিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কোন কথাই বলিল না, কেবল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মেডিকেল পরীক্ষা করিয়া, ডাক্তার এবং পুলিশটি launch করিয়া ফিরিয়া গেল। তারপর Pilot জাহাজখানি বন্দরে আনিল।

রাত্রে সাধারণতঃ জাহাজকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেয় না। সেইজন্য আমাদের জাহাজও বন্দরের বাহিরে সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিয়াছিল। পিনাং দ্বীপটি পরিমাণে ১০৮ বর্গ মাইল, উহা মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম কুলে, মালাক্কা প্রণালীর উত্তর দিকের প্রবেশ মুখে অবস্থিত। দ্বীপের বিপরীত তীরে দু দশ মাইল দূরে যে একটুকরা জমি, উহাই ওয়েলেস্‌লি প্রদেশ, পিনাং রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই প্রদেশটি গ্রন্থে

প্রায় ৮ মাইল এবং তীর ধরিয়া বরাবর ৪৫ মাইল লম্বা। ইহার লোকসংখ্যা নিম্নরূপ :—

	পুরুষ		স্ত্রীলোক
ইউরোপীয় ও আমেরিকান	৯৩৫		৪৪৫
ইউরেশীয়	৮৪১		১০৪৪
এশিয়াবাসী	১৮৯,৩১১		১১৬৯৩২
	১৯১,০৮৭	+	১১৮,৪২১
	=৩০৯,৫০৮		

সে সময়ের diary হইতে কতক কতক অংশ এখানে দিলাম—

Penang is a nice looking, though small town, full of hills. Near the coast there is a level plot of land. Here are the Government officers, dockyards and business houses. Behind it, residential quarters on the hills. From a distance, the place looks like Simla hills. There is a famous Buddhist temple on the hills. Penang is rather of a semicircular shape, like Benaras of India. By vitue of its situation the place affords great facilities for a harbour.

The coast of the mainland that is on the other side of the boat I am in, Penang town being on one side, presents a very picturesque scenery on account of rows of cocoanut trees. Here I noticed a peculiar kind of native boat plying between our ship and the Island. It is of Mourpankhi shape Instead of pulling the oars towards oneself, the boatsman does the opposite here. He rather throws the oars with a forward motion. The natives are Malays, but the Chinese are ousting them from every business There is a waterfall Electric trams have also been introduced.
There is a regular ferry service between the Penang island and the mainland. The staple food of the place is rice, which is taken with fish and vegetable curry."

[অর্থাৎ, পিনাং একটি সুদৃশ্য, অথচ ক্ষুদ্র পার্বত্য নগর। উপকূলে সমতল ভূমি—এইখানেই সরকারী অফিস, সওদাগরী হাউস এবং dockyards অবস্থিত। ইহার পিছনে, পাহাড়ের উপর বসতি স্থান। দূর হইতে স্থানটি ঠিক শিমলা পাহাড়ের ন্যায় দেখায়। পাহাড়ের মাথায় একটী বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির আছে। পিনাং সহরটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি, যেন ভারতের বারাণসী ধামের মত। অবস্থিতি গুণে ইহা উৎকৃষ্ট

বন্দর হওয়ারই উপযুক্ত স্থান। আমাদের জাহাজের এক দিকে পিনাং সহর, ইহার অন্য দিকে বিস্তৃত উপকূল, তাহার দৃশ্যটি বড় সুন্দর, ছবির মত মনোরম। সেখানে সারি সারি নারিকেল গাছ। এইখানেই এক নূতন ধরণের স্থানীয় নৌকা নয়ন গোচর করিলাম —জাহাজ হইতে দ্বীপে এইগুলি যাতায়াত করে। ইহাদের আকৃতি ময়ূরপঙ্খী ঢঙের। মাঝি দাঁড় কোলের দিকে না টানিয়া বরং ঠিক উল্টা করে সে সামনের ঝোঁক দিয়া ছুঁড়িয়া দেয়। এখানকার অধিবাসীবৃন্দ মালয় জাতি, কিন্তু চীনেরা ইহাদিগকে প্রত্যেক ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে। এখানে একটী জলপ্রপাত আছে, সহরে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামও চলিতেছে। পিনাং দ্বীপ এবং মূল উপকূলের মধ্যে পাকা খেয়া-পারের ব্যবস্থা আছে। এখানকার প্রধান খাদ্য ভাত, ইহারা মাছ ও শাকসবজির তরকারীর সঙ্গে তাহা খায়।]

জাহাজটা বন্দরে আসিতেই, অনেকগুলি ফেরিওয়ালা আমাদের জাহাজে আসিয়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ঘিরিয়া ধরিল, টাকা পয়সার Exchange করা থেকে picture Post card ফল, ইত্যাদি সামগ্রী ইহারা বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়াছে। সুবিধা পাইলে এই সমস্ত ফেরিওয়ালারা ৫ পয়সার জিনিস ২০ পয়সাতে বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সহরটাকে দেখিবার জন্য জাহাজ হইতে নামিল। জাহাজ থামিবার কিছুক্ষণ পরে দেখি ২ জন বাঙ্গালী বাবু জাহাজ থেকে যে সমস্ত মাল নামাইয়া দিতেছে এবং ফের জাহাজে যে মাল চড়ান হইতেছে তাহাদের হিসাব লিখিতেছেন। পোষাক আমাদের দেশের। দেশের পোষাক সেই-ই আমার শেষ দেখা। ইতিমধ্যে একজন বাঙালী মুসলমান ব্যবসাদার আমাদের জাহাজে আসিলেন। আমাকে দেখে দেখিয়াই ভারতবাসী জানিয়া সেলাম করিলেন এবং পিনাং ও সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দিলেন।

সিঙ্গাপুরে পূর্বে যে ভারতীয় সৈন্যরা স্বাধীনতা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই জানাইলেন। সেই ঘটনার জন্য অনেকজন ভারতীয় soldiers ও civilians কে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন পলাইয়া যায়। তখনও পর্যন্ত তাহাদের ধরিতে পারে নাই।

এই ভদ্রলোকের মতে ইংরাজ এটাকে mutiny বলিলেও প্রকৃতপক্ষে এটা war of altruism. সিঙ্গাপুরের এবং হংকঙের সৈনিকরা ইহাই ঠিক করিয়াছিল, যে তাহারা মালয় এবং চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যে সমস্ত জায়গা জোর করিয়া লইয়াছে তাহা মালয় এবং চীনা অধিবাসীদের ফিরাইয়া দিবে। ভারতীয় সৈনিকেরা international laws ও treaties, কিম্বা war strategy ও tactics না জানিলেও তাহাদের হৃদয় কত বড় তা উপরোক্ত ঘটনাতেই জানা যায়। সেইজন্য এই ঘটনাকে war of altruism or liberation বলাটাই ঠিক। নিজের দেশের জন্য সকলেই লড়ে, কিন্তু এই রকম পরের দেশ তাহার শত্রুর কাছ থেকে লইয়া তাহার প্রকৃত অধিকারীদের ফিরাইয়া

দিবার জন্য খুব কমলোকেই মরিতে রাজী হয়। এই স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম বলিয়া বোধ হয়।

আমি পূর্বে একথাটা জানিতাম না। সেই দিনই প্রথম জানি এবং তারপরে অনেক লোকের কাছ থেকে এ বিষয়ে শুনিয়াছি।

এই ঘটনার পর থেকে প্রত্যেক ভারতবাসীকে পুলিশের ছাড়পত্র না লইয়া সিঙ্গাপুরে নামিতেও দিত না এবং সেখান হইতে বাহিরে যাইতেও দিত না। যে সমস্ত ভারতবাসী এখন সিঙ্গাপুরে যাইতেছে প্রত্যেককেই পুলিশ পরীক্ষা করিতেছে। সেখানে পুলিশের পাহারা খুব কড়া। আমি এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া একটু চিন্তিত যে না হইয়াছিলাম তা নয়। যাহা হইবার তাহাই হইবে, এখন তো আর ফিরিয়াও যাওয়া যায় না।

বেলা ৩টার সময় Captain বলিল, যে জাহাজ শীঘ্রই ছাড়িবে। ঠিক বৈকালে ৪টার সময় জাহাজ নঙ্গর উঠাইয়া ছাড়িয়া দিল। আস্তে আস্তে পিনাং থেকে অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম, শেষে পিনাংটা একটি ছোট বড়ির মতন দেখা যাইতে লাগিল। পরের দিন (অর্থাৎ) ২১শে মে fine weather and smooth sea ছিল: এবং জাহাজখানা তীর থেকে বেশীদূরে দিয়া না যাওয়াতে অনেক সময় তীরের দৃশ্যাবলী খুব ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল।

সিঙ্গাপুরে

রাত্রে আহারের সময়ে Captain বলিল, যে কাল (অর্থাৎ ২২শে মে ১৯১৫) সকালে জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিবে। রাত ৪ টার সময় গরমে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ইলেক্‌ট্রিক্ পাখাটা চালাইয়া দিলাম। তাতেও ঠাণ্ডা হয় না দেখিয়া ডেকে গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। ৪৷৷ সাড়ে চারটা বাজিলে স্নানঘরে গিয়া সমুদ্রের জলে স্নান করিলাম। তারপর টোষ্ট এবং কফি খাইয়া ইউরোপীয় পোষাক পরিয়া ডেকে বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে জাহাজের ডাক্তারটি (একজন জাপানী) আমার কাছে আসিয়া বসিলেন, তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া সিঙ্গাপুরটি আমায় দেখাইয়া দিলেন। বেলা ৭টার সময়ে জাহাজখানা বন্দরের বাহিরে আসিয়া থামিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে একটি Police Launch আমাদের জাহাজের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং তাহাতে ২জন সাহেব এবং ১২৷১৪ জন পুলিশ।

বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তবে কি ইংরেজ সংবাদ পাইয়াছে যে আমি এই জাহাজে আছি? তাহা না হইলে অতগুলো পুলিশ কেন আসিতেছে? পিনাঙে কেবলমাত্র একজন পুলিশ আসিয়াছিল। কিন্তু এখন আসিতেছে এক ডজনেরও বেশী। এত পুলিশের আবশ্যক কি? আমাকে ধরিবার জন্যই কি এত পুলিশ আসিতেছে? এই

সমস্ত ভাবিতেছি ইতিমধ্যে Launch খানা জাহাজের ধারে আসিল এবং পুলিশের লোকেরা জাহাজে চড়িল।

একবার এই সময়ে ভাবিলাম যে জাপানীরা খুব chivalrous শুনিয়াছি, Captain কে প্রকৃত পরিচয় দিয়া Japanese flag-এর আশ্রয় চাহিব কি? পরক্ষণেই ভাবিলাম, ইংরাজের jurisdiction-এর মধ্যে Captain ইচ্ছা থাকিলেও সেখানে কিছুতেই আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না।

ইতিমধ্যে পুলিশের সাহেব দুটি আমাদের খাবার ঘরে আসিল এবং সেই সঙ্গে কেবলমাত্র একজন Malaya Inspector আসিল। ১, ২, ৩, এই রকম করিয়া প্রায় ১০ মিনিট কাটিল, তখন এরা যে আমার জন্য আসে নাই তাহা বুঝিলাম। এই সময়ে জাপানী যাত্রীদের মধ্যে একজন আমার পাশের চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের scenery সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

৫ মিনিট বাদে আমার কামরায় যে ভারতীয় মুসলমানটি আছেন তিনি আসিয়া বলিলেন, যে আমাদের finger impression পুলিশ লইবে, এই কথা পুলিশের একটি সাহেব তাহাকে বলিয়াছে। ইতিমধ্যে Purser আসিয়া আমায় বলিল, যে আমার finger impression পুলিশকে দিতে হইবে।

আমি বলিলাম, যে আমি একজন First Class Passenger, এবং আমার আত্মীয়দের Viceroy পর্য্যন্ত জানে। আমার কাছ থেকে finger impression লইয়া আমার familyকে অপমান করা ঠিক নয়। Purser বলিল, যে "ইংরেজ Police officer দের সঙ্গে এ বিষয়ে ঝগড়া করিয়া লাভ কি। ওরা ইচ্ছা করিলে বে-আইনী কার্য্য করিতে পারে এবং অনেক করিতেছে। ওদের চটাইয়া লাভ নাই, finger impressionটা দিয়ে দিন।" আমি ভাবিলাম, Purser যা বলিয়াছে তা ঠিকই, আমার finger impression দিলাম। যাহারা সিঙ্গাপুর দেখিবার জন্য কিম্বা কোনও কাজের জন্য জাহাজ হইতে নামিতে চাহিল, তাহাদিগকে এক একটি Permit দিল। সেই Permit না হইলে কেহই সিঙ্গাপুরে নামিতে পারিবে না। Third Class Passenger-দের মধ্যে কেবল ১২ জন শিখকে Permit দিল না। এই ঘটনা সম্বন্ধে আমি ডায়েরীতে যা লিখিয়া ছিলাম, তাহার একটা নকল এখানে দিলাম :—

"After the Indian rising here, the Govt. has ordered that all Indians wishing to go out of Singapore or to come to Singapore must obtain a police permit. According to this ruling, all the Indian Passengers had to apply for permits, which were granted to all except 12 Sikhs who were going to Hongkong. The Singapore police said that they acted according to the instructions of the Govt. of India which were to the effect that the 12 Sikhs should under no circumstances be allowed to land there. One police man was posted there with instructions not to allow them to get out of the ship.

The Sikhs came to me and said that their provisions had run short, If at least one of them is not allowed to land for buying necessary provisions for their trip to Hongkong, they shall have to starve. I went to the Captain and explained to him the situation. He immediately wrote a letter to police superintendent requesting him to permit at least one of the 12 to land for an hour for buying the required provisions. (The third and second class passengers had to prepare their own food.) I sent the Indian who was in my cabin to the police office with the letter. Half an hour later he came back together with a Malay gentleman, the Sub-Inspector of the police station. When I explained to him what difficulty the Sikhs would experience if one of them even is not allowed to go to the town, he seemed to be very sympathetic. He himself then condemned this unreasonable and unjust order and said that he would try his best to persuade his chief to give permits to these people. And he really tried, but the d-d-chief would hear of no arguments and reasonings. The Sub-Inspector came back to me greatly agitated. He then commenced to vilify the Sahebs and prayed for the curse of Allah on on them "

Police এক ঘণ্টা পরে ফের Launch করিয়া ফিরিয়া গেল। ইতিমধ্যে ৮টা বাজিলে Pilot আসিয়া জাহাজখানি ডকে লইয়া গেল।

সিঙ্গাপুর দ্বীপ প্রায় ২৭ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া, ইহা ২১৭ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান এবং মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পোনে এক মাইল চওড়া এক প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। নিকটবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া এই settlement গঠিত। Straits settlements অর্থাৎ সিঙ্গাপুর, পিনাঙ ও মালকা লইয়া যে খাস উপনিবেশ, তাহার রাজধানী সিঙ্গাপুর সহরেই। এই সহরের জনসংখ্যার হিসাব এই :—

	পুরুষ	স্ত্রী
ইউরোপীয় ও আমেরিকান—	৫,৩০১—	২,০৮৫
ইউরোপীয়—	২,৯৩০—	৩,১৪৪
এশিয়াবাসী—	২৭৩,৭২২—	১১১,০৯১
সমষ্টি—	২৮১,৯৫৩	২১৬,৩২৮

সমগ্র উপনিবেশে ভারতীয়দিগের সংখ্যা মোট প্রায় ৯৪,০০০।

সিঙ্গাপুর সহরটা খুব বড়। ট্রাম চলাচল আছে। একটি রেলওয়ে এখান থেকে জহোরে যায়। জাহাজ থামিলেই আমি একটি জাপানী ভদ্রলোকের সহিত সহরটি দেখিবার জন্য জাহাজ থেকে নামিলাম। একটী রিক্‌শ ভাড়া করিয়া সহরটা দেখিয়া ১ ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজে ফিরিলাম, সহরটা বেশ পরিষ্কার এবং এটা international town-এর মতন মনে হইল। দুনিয়ার প্রত্যেক জায়গার লোক এখানে আছে। সিঙ্গাপুরের বন্দরটাও খুব বড়। অনেকগুলি জাহাজ আশ্রয় লইতে পারে। জর্মন ক্রুজার Emden-এর উপদ্রবের পরে, সিঙ্গাপুরের কাছের সমুদ্রে জাপানী যুদ্ধ জাহাজ পাহারা দিতেছিল। আমাদের জাপানী সহযাত্রীরা নিজেদের রণপোত দেখিয়া বড়ই খুশী। আমাকে বলিল, দেখুন ঐগুলি আমাদের warships। জাপানের warships —এই কথাটা শুনিয়া বেশ একটা আনন্দ হইল।

কিন্তু এক সেকেন্ড পরেই চোখ থেকে ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, হায়, আমরা কি মহাপাপ করিয়াছিলাম যে আমাদের একখানিও রণপোত নাই! ভারতের ১৬০ বছরের ইংরাজ রাজত্বের ফলে আজ আমাদের একখানিও যুদ্ধ জাহাজ নাই, কেবল তাই নয়, ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা ৯৯ জনেরও বেশী লোক শবের মতন হইয়া edncated বলিয়া গর্ব করেন তাহাদের মধ্যে শতকরা একশতেরও উপর নির্জীব, আছে। বিশেষরূপে যারা নিজেদের কাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের মধ্যে যারা ২/৪টা ইংরাজি বলিতে এবং লিখিতে পারেন তারা প্রায়ই British justice and fair play, Un British rule ইত্যাদি phraseology ব্যবহার করেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে justice জিনিষটা কোনও দেশের একচেটে কি? British justice and fair play বলিয়া কোনও জিনিষ নাই। "Un British rule" কথাটারও মানেই নাই। বরঞ্চ বিগত ১৬০ বছরের ইতিহাসে প্রমাণ হয় ঠিক উল্টো কথা।

হংকঙে

হংকঙে ২৯শে মে ১৯১৫ সকালে ৮টার সময় আমরা হংকঙে পেঁছিলাম। হাওয়াটা মনোরম এবং তত গরমও বোধ হইল না। একজন পুলিশ অফিসার আসিয়া সমস্ত যাত্রীদের পরীক্ষা করিয়া নামিবার জন্য অনুমতি দিল। অবশ্য প্রথমশ্রেণী যাত্রীদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের examine, cross examine, অনেক করিল। কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, বাপের নাম, দেশের ঠিকানা, কি কার্য করে ইত্যাদি। হায় টাকা, তোমার মহিমা অনেক। প্রথম শ্রেণী এবং অপর শ্রেণীর লোকেরা সকলেই মানুষ, সকলেরই ভিতরে ভগবান আছেন। অথচ প্রথমশ্রেণী যাত্রীদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হইল না! কারণ কি? কারণ তাহারা বেশী টাকার টিকিট কিনিয়াছে। যাহারা সবচেয়ে দামী টিকিট কিনিতে পারে, তাহারা কখনই খারাপ লোক হইতে পারে না! অর্থাৎ যাহাদের টাকা আছে, তাহারা কখনও খারাপ কাজ করিতে পারে না! এ ধারণাটা Capitalism-এর ফল। টাকা থাকি-

নেই, গণ্যমান্য ব্যক্তি, টাকা না থাকিলে যতই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান হউক না কেন, সমাজ এবং দুনিয়া তাহাকে মানিতে রাজী নহে।

ভারতে চার বর্ণভেদ আছে ; সব জায়গাতেই এই ভাবের সামাজিক ভেদ আছে। পৃথিবীর ইতিহাস দেখিলে, প্রথমে পুরোহিত সম্প্রদায় দুনিয়াটাকে শাসন করিয়াছিল। তাহাদের মুখের কথাই তখন আইন হইয়াছিল। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত এবং করিয়াছিল। এশিয়ার পুরোহিতরা যেমন এশিয়াতে প্রভুত্ব করিয়াছিল, ইউরোপের পুরোহিতরাও তেমনি সেখানে নিজেদের প্রভাব সৃষ্টি করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছিল। এটাকে আমি জগতের ব্রাহ্মণ-যুগ বলি। তারপর ক্রমশঃ ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ক্ষমতাটা হারাইল এবং জগতের দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়েরা দুনিয়াটাকে শাসন করিল। এই সময়ে যাহার বাহুবল ছিল সেই গণ্যমান্য হইল। দুনিয়া এবং সমাজ তাহাকেই সম্মান করিতে প্রস্তুত। Industrial revolution অর্থাৎ machine এবং steam engine-এর আবিষ্কারের পর Capitalism অর্থাৎ বৈশ্যযুগ আসিল। এবং এখনও সে যুগ চলিতেছে।

এখন কেবল বিদ্যা বুদ্ধি, কিম্বা বাহুবল থাকিলেই দুনিয়া সম্মান করিতে রাজী নয়। যতক্ষণ না অর্থবল হয় ততক্ষণ সমাজ থেকে সম্মান পাওয়া যায় না। পূর্বে ব্রাহ্মণ যুগে বিদ্যা থাকিলেই সকলে তাহাকে মানিত, ক্ষত্রিয় যুগ আসিলে খালি বিদ্যা কিম্বা অর্থ থাকিলেই কেহ মানিত না ; যতক্ষণ পর্যন্ত বাহুবল না থাকিত ততক্ষণ কেহ মান্য করিতে রাজী ছিল না। এখন বৈশ্যযুগ (Capitalistic era) টাকাই প্রধান এবং টাকা থাকিলেই সকলে মানিতে রাজী এবং সেই জন্যই প্রথম শ্রেণী যাত্রীদের কেহ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন কথা হইতেছে যে এর পরে কোন্ যুগ আসিবে ? ভগবানের বিধানই বল আর স্বভাবের নিয়মই বল, এই বিধান অনুযায়ী ভবিষ্যতে শূদ্রশ্রেণী দুনিয়াটাকে শাসন করিবেই। তাহার লক্ষণ রাশিয়াতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দুনিয়ার যে দিকেই দেখ, শূদ্র সম্প্রদায় (Labour) মাথা উঠাইতেছে, এবং তাহাদের সময় আসিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যযুগে দুনিয়ার লোকেরা সুখী হয় নাই। পৃথিবীতে শান্তি আসে নাই। শূদ্রযুগেও দুনিয়াতে সুখ শান্তি আসিবে না। এই শূদ্রযুগ একটা cycle complete করিবে। তারপরে একটা New period আরম্ভ হইবে। তখন দুনিয়াতে সুখ শান্তি আসিবে।

হংকঙ ঠিক কাণ্টন নদীর মোহানায় অবস্থিত এবং কাণ্টন সহর হইতে ইহা ৯০ মাইল দূরে। দ্বীপটি উচ্চ অসমতল ভূমি, পাহাড়ে ডাঙ্গা, ইহা পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১১ মাইল বিস্তৃত, প্রস্থে দুই হইতে পাঁচ মাইলের মধ্যে এবং পরিমাণে ৩২ বর্গ মাইল। মূল উপকূল এবং হংকঙের মাঝে যে সরু প্রণালী তাহা প্রায় আধ মাইল চওড়া। অপর তীরস্থ কৌলুন উপদ্বীপ খাস উপনিবেশ হংকঙেরই অন্তর্ভুক্ত।

সমগ্র উপনিবেশের জনসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। হংকঙ, চীন ও জাপানের সহিত ইংরাজের বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র এবং ইহা একটী প্রথম শ্রেণীর একাধারে

সামরিক আড্ডা ও নৌবন্দর। এখানে ইংরাজদিগের এক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ইহাতে ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং এবং কলাবিদ্যার বিভাগ খোলা হইয়াছে। এখানে বৈদ্যুতিক ট্রামের ব্যবস্থা আছে এবং একটী Cable tram way-এর দ্বারা Peak district-এর সহিত সহরের ঢালু জমির সংযোগ বিধান করা হইয়াছে। এখান হইতে কাণ্টনে একটি রেলওয়ে চলিয়াছে।

আমাদের জাহাজ কোলুনে নঙ্গর করিল।

কোলুন থেকে হংকঙ সহরে যাইবার জন্য খেয়া ষ্টীমার আছে। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ১৫ সেণ্ট (হংকঙ কারেন্সি)। আমি এবং আর ২ জন সহযাত্রী জাহাজ থেকে নামিয়া সহরটা দেখিতে গেলাম।

তখন প্রায় ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। একটি জাপানী হোটেলে গিয়া আহার করিয়া Peak district দেখিবার জন্য Cable tramway-তে চড়িলাম। Cable-তে ট্রামটিকে সহর থেকে peak-এর উপরে টানিয়া তুলিল। Gradientটা ভয়ানক খাড়া। উপরে গিয়া দেখিলাম, যে দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। দৃশ্য মাধুর্য্যে হংকঙের কাছে সিঙ্গাপুর কিম্বা পিনাঙ কোথায় লাগে ? সেখান থেকে নামিয়া আসিয়া আর কিছুক্ষণ সহরে থাকিয়া, জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম।

জাহাজে আসিতেই Purser মহাশয় বলিলেন, আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, এখানকার গভর্ণমেণ্ট এই রুল জারী করিয়াছে যে, যে কোনও ভারতবাসী হংকঙ থেকে বাহিরে যাইবে, তাকে পুলিশের একটি Permit লইতে হইবে। এমন কি যারা যারা অপর জায়গা থেকে আসিয়া হংকঙ হইয়া জাপানে যাইবে তাদেরও এই Permit লইতে হইবে।

ভাবিলাম একি বিপদ ! শেষে ডাঙ্গার কাছে আসিয়া নৌকা ডুবিবে কি ? হংকঙ ছাড়িলেই ইংরাজ এলাকার বাহিরে যাই। কারণ হংকঙের পর জাহাজখানা সোজা একেবারে কোবেতে যাইবে, স্থির ছিল। মনে অনেক ভাবনা হইল। শুনিলাম যে জাহাজ ছাড়িবার কিছু আগে পুলিশ আসিয়া Permit examine করিবে। কি করা যায় ? সমস্ত রাত্রি ভাবিলাম। স্থির করিলাম যে, পুলিশ অফিসে গিয়া Permit এর জন্য apply করিব।

সকালে উঠিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া মনটাকে দৃঢ় করিয়া, বরাবর পুলিশ অফিসে গিয়া হাজির। সেদিন রবিবার। Police superintendent কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, একজন শিখ পুলিশ (এখানে পুলিশ প্রায় সমস্তই ভারতবাসী) বলিল, যে আজ রবিবার বলিয়া তিনি অফিসে আসিবেন না, তবে, ছোট সাহেব অফিসে আছেন, তাঁহাকে Permit-এর সম্বন্ধে বলিতে পারেন।

আস্তে আস্তে অফিসে ঢুকিলাম, আর্দালিকে চাপরাশী পিয়নকে বলিলাম, ছোট সাহেবের সঙ্গে "জরুরী কামের" জন্য "মুলাকাৎ" করিতে চাই।

সে তৎক্ষণাৎ সাহেবের কাছে একথা জানাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া, সাহেবের ঘরে আমাকে যাইবার জন্য বলিল। ছোট সাহেবের ঘরে গিয়াই হাতটা তুলিয়া মাথা নোয়াইয়া সাহেবকে "Good morning" করিলাম। সাহেব আমার বিলাতী পোষাক, হ্যাট সমেত দেখিয়া, আমি যে একজন Europeanised Indian তা বুঝিয়া ছিলেন বোধহয়।

তৎক্ষণাৎ আমায় Good morning করিয়া একটি চেয়ারে বসিবার জন্য বলিলেন। চেয়ারে বসিলে, সাহেব আমি কি চাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম, যে আমি একজন ছাত্র, জাপানে পড়িতে যাইতেছি, আমার জাহাজ কাল ছাড়িবে, আমায় একখানি "Permit" দিন। সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পরে বলিলেন, যে বড় সাহেব আজ নাই, আপনি কাল সকালে আসিবেন, তাহা হইলে 'Permit' পাইবেন। আমি বলিলাম যে আমার জাহাজ কাল খুব সকালে ছাড়িবে, কাজেই আজ Permit না পাইলে কাল আমি যাইতে পারিব না। আমার কপালটা অনেক ভাল, এই কথা শুনিয়া সাহেব সেই ঘরের কোণে একজন শিখ কেরানী বসিয়া কার্য্য করিতেছিল, তাহাকে ডাকিলেন। সে আসিলে আমার জন্য একটি 'Permit' লিখিবার জন্য সাহেব তাহাকে বলিলেন। Clerkটি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম—P. N. Tagore"-এ পর্য্যন্ত এই নামেই চলিতেছিল।

সে বলিল, পুরা নামের দরকার তখন মুখ থেকে বাহির হইয়া গেল, "Preo Nath Tagore", "Permit" লিখিয়া সে লইয়া আসিলে, ছোট সাহেব সেখানিতে দস্তখত করিয়া আমায় দিলেন, আমি সেখানি লইয়া তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। ইতিমধ্যে আর একজন মুলতানের লোক কাণ্টন যাইবার জন্য "Permit" লইতে আসিল। সাহেব তাহারও "Permit" তৈয়ারী করিবার জন্য শিখ কেরাণীকে বলিলেন। ইতিমধ্যে সাহেব, সে কোথা থেকে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল যে ম্যানিলা থেকে আসিয়াছে ব্যবসা করিবার জন্য। যেমন শুনিলেন যে ম্যানিলা থেকে সে লোকটি আসিয়াছে, অমনি কেরাণীকে ডাকাইয়া তাহার জন্য "Permit" লেখা বন্ধ করিতে বলিলেন। মুলতানী বেচারী অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু ছোট সাহেব তাহাকে "Permit" দিলেন না! ইতিমধ্যে আমি সাহেবকে "সেলাম" করিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িলাম।

এই "Permit" টি এখনও আমার কাছে আছে এবং ইহার একটি অবিকল নকল এখানে দিলাম—

"Permit" No 158

The bearer Preo Nath Tagore, description as below, has Permission to proceed from Hongkong to Kobe, Japan, by S. S. Sanuki Maru, leaving on 31st May 1915.

Description

Age—23 years
Village and District······Calcutta.
Height—5 feet+6 inches
Caste—Brahman, Hindu.
Occupation—Student
Nationality—Indian.

Hongkong
30/5/15

Sd. P. Bragil
for Captain
Superintendent
of Police"

Permit খানি লইয়া সোজা জাহাজে আসিতেছি, এমন সময়ে একজন শিখ পুলিশ আমায় নমস্কার করিল।

আমিও প্রতি নমস্কার করিলে সে বলিল, "বাবুজী, দেশকা হালচাল ক্যাসা হ্যায় ?"—"বাবুজী দেশের হালচাল কি ?" দেখিলাম, আমি দেশ থেকে আসিয়াছি জানিয়া সে দেশের সংবাদ জানিতে বড়ই ইচ্ছুক। দেশের সংবাদ মানে রাজনৈতিক সংবাদ।

একবার মনে হইল, লোকটা চর নয় ত ? কিন্তু তাহার হাসিভরা মুখখানা দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুজনে অনেক কথা কহিলাম। সে লোকটি ওখানকার পুলিশের জমাদার, কিন্তু সে প্রকৃত ভারতবাসী। জমাদার বলিয়া নিজের দেশটাকে ভুলে নাই।

সে বলিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক দেশের জন্য সদাসর্বদা "জান" দিতে রাজী। তারা কেবল চায় একজন নেতা। ইহার কাছ থেকেও শুনিলাম যে ইহাদের মতে এই লড়াইয়ের সুযোগে হংকঙের ভারতীয় সৈন্য এবং পুলিশ মিলিয়া ইংরেজকে এখান থেকে তাড়াইয়া দিয়া এ জায়গাটা চীনকে দেওয়া উচিত।—এই কথা শুনিয়া আমার চোখটা জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার গায়ে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলাম, "ভাই হঠাৎ কিছু করিও না, এখন কিছুদিন অপেক্ষা কর, সময় শীঘ্র আসিবেই, তখন ভারতের জিনিষ চীনকে দিবে।" বেচারী আমার সঙ্গে বরাবর জাহাজ পর্যন্ত আসিল, সে রাত্রে তাহার বাসায় খাইবার জন্য অনেক বলিল, শেষে আমি যদি না যাইতে পারি, তাহা হইলে সে খাবার তৈয়ারী করিয়া জাহাজে লইয়া আসিবে বলিল। আমিঅনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া খাবার আনিতে বারণ করিলাম। দুজনে দেশের সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। সে যখন দেশের সম্বন্ধে বলিতেছিল, তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। অথচ এই লোকটা ইংরাজের কর্মচারী পুলিশের জমাদার। রাত্রি অনেক হওয়ায় সে বিদায় চাহিল। আমি ভাই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলাম।

এই লোকটির সঙ্গে কথা কহিয়া মনটা যেন খুব প্রফুল্ল হইল। ভারতের আশা আছে। নিরাশ হইবার কারণ নাই। এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত হইল। Purser-এর কাছে যাইয়া Permit খানি রাখিয়া আসিলাম।

সে রাত্রিতে অনেক কথাই মনে হইল।

১৯০৮ থেকে দেশ ছাড়ার দিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছি তাহা একে একে মনে পড়িল। এই শিখ পুলিশ জমাদারটির কথাগুলিতে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

আর ৮ ঘণ্টা। ৮ ঘণ্টা কাটাইতে পরিলেই আমি নিরাপদ। হংকং থেকে জাহাজ ছাড়িলেই আমি British Jurisdiction-এর বাহিরে যাইব, ইংরেজ আর আমায় ধরিতে পারিবে না। কিন্তু জাপানেতেই বা কি করিব এবং আমার উদ্দেশ্য সাধনের কি সুযোগ আছে? বন্ধু-বান্ধবহীন অচেনা জায়গায় কি কার্য্য করিবার সুবিধা পাইব? এই রকম চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার কেবিনে যে আর একজন ভারতবাসী আছে, তাহার ডাকে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চোখ খুলিয়া দেখি, যে সে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এবং একজন সাহেব দরজার বাহির থেকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

ভারতবাসী বলিল, যে পুলিশ অফিসার (অর্থাৎ যে সাহেবটি উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল) Permit দেখিতে চাহিতেছে।

আমি উত্তর দিলাম—Permit Purser-এর কাছে আছে, সেখানে গিয়া দেখিবার জন্য সাহেবকে বল। সাহেব আমার কথা শুনিতে পাইয়াই, "That is all right" এই বলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই জাহাজখানা ছাড়িয়া দিল। জাহাজটা যখন ছাড়িয়া দিল, তখন যেন আমার মন থেকে একটা বোঝা নামিয়া গেল। আরও প্রায় এক ঘণ্টা শুইয়া রহিলাম। যখন ৭॥টা বাজিল, তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া পোষাক পরিলাম। পোষাক পরিয়া ডেকে গিয়া বসিলাম। জাহাজটা তখন full speed দিয়াছে।

জাপানের দিকে

আজ হইল ৩১শে মে ১৯১৫। কোবে আমরা ৫ই জুন পৌঁছিব। আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার কেবিনের ভারতবাসী জাহাজের ডাক্তার এবং First officer আসিয়া আমার কাছে বসিল। তখন প্রথম আমি তাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলাম। জাহাজ যতই জাপানের দিকে যাইতে লাগিল ততই হাওয়াটা নরম হইতে লাগিল। ২রা জুনে সমুদ্রে একটু তুফান ছিল। তার পরদিন সমুদ্রটা শান্ত ছিল।

কোবে

আজ ৫ই জুন। সকালে উঠিয়াই দেখিলাম যে তীরভূমির খুব কাছ দিয়াই আমরা যাইতেছি। দূরে অনেকগুলি জাপানী রণপোত এবং মাছ ধরা তরী দেখা গেল। জাহাজের কাপ্তেন হইতে নাবিক পর্যন্ত সমস্ত জাপানীই প্রায় আড়াই মাসের পরে আজ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিতে পারিবে বলিয়া খুব আনন্দিত।

হংকঙেই আমি ও আমার কামরার দেশভাইটি এবং তৃতীয় শ্রেণীর ২জন পাঠান ছাড়া সমস্ত ভারতবাসী নামিয়া গিয়াছে। হংকঙ থেকে কতকগুলি চীনা তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছিল, তারা জাপানে যাইবে। আমরা দুইজন এবং এই চীনারা ছাড়া আর সমস্ত যাত্রীই জাপানী। ঠিক বেলা ৩টার নময়ে জাহাজখানি কোবেতে পেঁাছিল।

যে কয়জন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিল। জাহাজ থামিতেই তাহাদের বন্ধুরা তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য জাহাজে আসিল। আমার দেশভাই মুসলমানটিরও একজন ভারতীয় বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

আমাকে Receive করিবার জন্য অবশ্য কেহই আসিল না এবং আসিবার কারণও ছিল না। জাহাজের ডাক্তার সেই সময়ে আমার কুঠুরীর কাছে আসিলেন। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া আছি দেখিয়া, আমি কোবেতে দিন কয়েক থাকিব কি বরাবর টোকিও দেখিতে চাই। যাইব, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম, অন্ততঃ একদিন থাকিয়া সহরটাকে দেখিতে চাই। তাতে তিনি বলেন, যে তাহা হইলে কোন জাপানী হোটেলে থাকুন, বিদেশী হোটেলের চেয়ে খরচ কম। ইতিমধ্যে ৫।৬টি হোটেলের পাণ্ডা আমায় ঘিরিয়া ধরিয়াছে। ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি হোটেল ঠিক করিলাম এবং পাণ্ডাটিকে আমার তোরঙ্গটা লইয়া যাইবার জন্য বলিলাম।

কেবিন ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া জাহাজ হইতে নামিবার সময়ে দেখি যে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠান দুটিও বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তারা কোথায় থাকিবে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, যে এখনও তাহারা কিছু ঠিক করে নাই। আমি বলিলাম, যে আমি একটি হোটেলে যাইতেছি, তারা সেখানে উপস্থিত তাহাদের জিনিষ রাখিতে পারে এবং একটু বিশ্রাম করিতে পারে। তাহারা তাহাতে রাজী হইয়া আমার সঙ্গে চলিল।

এখন আমাদের লইয়া একখানি লাঞ্চ Customs Office'-এর সামনে গিয়া থামিল। আমার তোরঙ্গটা পাণ্ডা Customs Office এ লইয়া যাইতেই Customs Officerটি বাহিরে আসিয়া আমায় নমস্কার করিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আমি কি Mr. Tagore ?

আমি বলিলাম, যে আমি টেগোর এবং কিছু পূর্বে সানুকি মারু হইতে নামিয়াছি।

এই কথা শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনার জন্য আমেরিকা হইতে কতকগুলি পত্র আসিয়াছে, সেগুলি আমাদের অন্য অফিসে আছে, এখনি আনাইয়া দিতেছি।

আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। আমার জন্য আমেরিকা হইতে পত্র আসার কারণ নাই। আমি জাপানে পৌঁছিয়া পত্র এবং ঠিকানা দিলে, তবে দেশের বন্ধুরা আমায় পত্র দিবে, এই কথা ছিল। কিন্তু আমেরিকা হইতে পত্র আসার মানে কি?

হঠাৎ মানে পড়িল, কবীন্দ্র Tagore এর এখানে আসিবার কথা ছিল, এই সমস্ত পত্র তাঁহারই। আমি Officerটিকে বলিলাম যে পত্রের উপরে লেখা পুরা নামটা কি? তিনি বলিলেন, যে তখনই টেলিফোন করিয়া সে সংবাদটি অপর অফিস হইতে লইবেন। আমি যা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই। পত্রের ঠিকানা—Dr. Rabindranath Tagore। Customs Officer কে বলিলাম যে পত্রগুলি 'Poet Tagore-এর, আমার নয়, আমার নাম P. N. Tagore।

তিনি ভুল করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, যে ইহাতে ত আর ক্ষমা ভিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। বেচারী বড়ই ভদ্রলোক, তৎক্ষণাৎ আমার তোরঙ্গটি Pass করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার করমর্দন করিয়া হোটেলে গিয়া উঠিলাম।

পূর্বে শুনিয়াছিলাম, যে জাপানীরা কাগজের ঘরে বাস করে আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রথমে দরজায় গিয়াই আমাদের জুতা খুলিতে হইল। জাপানীরা জুতা ঘরে লইয়া যাইতে দেয় না। জুতা খুলিয়া দেশের চটি জুতার মতন স্লিপার পরিলাম। ইহা চামড়া দিয়া তৈয়ারী করে, আবার কেবলমাত্র পশম অথবা তুলার কাপড় দিয়াও তৈয়ারী করে। স্লিপার পরিয়া দোতলায় উঠিলাম। সেখানে একটি ঘরে আমাদের প্রবেশ করিতে বলিল। চটিজুতা সেখানে রাখিয়া বারান্দা থেকে দরজা খুলিয়া ঘরে গেলাম। দরজা মানে, একটি কাঠের ফ্রেম করিয়া তাহাতে কাগজ paste করা আছে। ঘরের মধ্যে মেঝেতে আমাদের দেশের "মাদুর," তবে অবশ্য অনেক মোটা। বসিবার জন্য আমাদেরআসনের মতন তুলা ভরা আসন। আমাদের আসনের মতনই চৌকা, এবং একই আকার।

ঘরে ঢুকিয়া বসিতেই, একটি চাকরানী আসিয়া আমাকে একটা প্রণাম করিল, ঠিক দেশের মত মেঝেতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। ব্যাপার কি? ঠিক জাপানেই আছি, না কি আমার দেশে আছি!

ভারতবাসীরা দুনিয়ার যেখানেই যাউক, তরকারীটা খাইতে পাইবে। দুনিয়ার এমন কোন যায়গা নেই যেখানে Curry Powder না আছে। সে রাত্রে আমি এবং পাঠান দুটি ভাত এবং Curry খাইলাম। হাত দিয়া খাওয়া অভ্যাস, প্রায় ১ মাস জাহাজে কাঁটা চামচ দিয়া খাইয়াছি তবুও কাঁটা দিয়ে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। খাওয়ার পর পাঠান দুটি শোবার জন্য একটি সস্তা হোটেলে গেল। আমি তারপর শীঘ্রই শুইয়া পড়িলাম।

আজ ৬ই জুন। সকালে উঠিয়া সহরটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। হোটেলে আসিয়া দেখি যে পাঠান দুটি আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাদের সঙ্গে

পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম, যে পরদিন কিওটো যাইব। সেখানে সেই রাতটা কাটাইয়া টোকিও অভিমুখে যাত্রা করিব। তাহারা চলিয়া গেলে আর একবার সহরটা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

কোবের লোকসংখ্যা ৫ লাখের উপর। সহরটার অর্ধেক পাহাড় এবং অর্ধেক সমভূমি। জাপানের বন্দরগুলির মধ্যে এটা একটা প্রধান। ওশাকা জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টারের মত industrial city, কোবের কাছে থাকায় এই বন্দরটি খুব develop করছে। এখানে প্রায় ১৫০ জন ভারতবাসী আছে। তাহারা ব্যবসায়ী মহাজন কিম্বা ব্যবসায়-শালার কেরানী। একটি বাঙ্গালী ফার্মও আছে এবং ৪।৫ জন বাঙ্গালীও এখানে আছে।

টোকিও হইতে কোবে পর্যন্ত 'main line' এর পশ্চিমে শেষ সীমান্তই কোবে সহর। সান-ইয়ো (অর্থাৎ কোবে হইতে শিমো নো সেকি) বড় লাইনের এখান হইতে আরম্ভ। এখানে সহরতলী ও উপনগর উভয় দিকে যাইবার ট্রামগাড়ী পাওয়া যায় কোবেতে বড় সুন্দর জলপ্রপাত আছে, এখানকার শিন্টো দেবমন্দিরটিও প্রসিদ্ধ। ইহার নাম নানকো, জাপানী ভক্তবীর কুসুনোকি মাসাশিগের নামে উৎসর্গীকৃত। ষ্টেশনের খুব কাছেই ইহা অবস্থিত। একঘণ্টার মধ্যে রেলপথে গিয়া, বেশ সুন্দর চিত্তাকর্ষক সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাস এবং গরম জলের উৎস পাওয়া যায়। সহরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মন্দির আছে।

এখানে তিনটি বিদেশী ধরণের হোটেল এবং অনেকগুলি জাপানী হোটেল আছে। আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানে থাওয়া দাওয়া সমেত দৈনিক F 2·50 (অর্থাৎ দেশের প্রায় ৪ টাকা) লইয়াছিল। বিদেশী হোটেলগুলিতে সে সময়ে দিনে ১০্ চার্জ করিত। কোবের একটি অংশকে "সান্নিমিয়া" বলে। বিদেশীদের সমস্ত অফিস এবং ব্যবসায়ের হাউসগুলি এইখানে। এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনও আছে।

আজ ৭ই জুন। সকলে পাঠান দুটি আসিয়া হাজির। তিনজনে ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিলাম। জাহাজের officer-দের কাছ থেকে ২।৪টি জাপানী কথা শিখিয়াছিলাম। তাছাড়া এখানকার ভাষা কিছুই জানিতাম না। টিকিট কিনিতে গিয়া Booking clerk-এর কাছ থেকে ইংরাজিতে টোকিওর তিনখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট চাহিলাম। জাপানের রেলগাড়ীর কেবলমাত্র তিনটি শ্রেণী। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইব ঠিক করিয়া তিনখানি টিকিট চাহিলাম। Booking clerkটি আমাদের একটি কথাও বুঝিতে পারিল না, আমার ২।৪টা জানা জাপানী কথা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহাতেও ফল হইল না। শেষে English to Japanese conversation নামে একখানি বই ছিল, সেটির পাতা উল্টাইয়া অনেক কষ্টে "টোকিওর টিকিট চাই" এই কথাটি বাহির করিয়া তাহাকে বলিলাম। কিন্তু আমার উচ্চারণের দোষে অকৃতকার্য্য হইলাম। ইতিমধ্যে আমাদের চারিধারে অনেক লোক জমা হইয়া গিয়াছে। তাহারা ভাবিতেছে আমরা কোথাকার লোক এবং কি ভাষায় কথা কহিতেছি।

ভিড় ঠেলিয়া একজন ইউরোপীয় পোষাক পরা জাপানী আসিয়া আমায় নমস্কার করিয়া অর্ধেক ইংরাজি অর্ধেক জাপানীতে জিজ্ঞাসা করিল, যে আমরা কোথায় যাইতে চাই। আমি ইংরাজিতে বলিলাম যে, কিওটো হইয়া একরাত্র সেখানে থাকিয়া টোকিওতে যাইতে চাই। বেচারীর একটু বুঝিতে কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, "please come", অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য বলিলেন। আমরা আর কি করি, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম।

ষ্টেশনের অপর ধারে আমাদের লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখি যে ইংরাজিতে একটি signboard আছে। তাহাতে লেখা আছে, "Japan Tourist bureau." আমরা যাইতেই একজন জাপানী ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল,—আমরা কি চাই। আমি তাহাকে কিওটো হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে টোকিও যাইতে চাই, বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের টিকিট কিনিয়া আনিয়া দিলেন। জাপানের একখানি English Map, English Time table and English Travel Guide আমাকে দিলেন। আমি দাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা বিদেশীদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়। তারপর কিওটো এবং টোকিও'র hotel ইত্যাদির সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ দিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

জাপানী গভর্নমেণ্ট বিদেশী পর্যটকদের সাহায্য করিবার জন্য Japan Tourist Bureauটি স্থাপিত করিয়াছে। টোকিওতে এই ব্যুরোর প্রধান কেন্দ্র এবং বড় বড় বন্দর এবং জংশন ষ্টেশনে শাখা কেন্দ্র আছে। এইখান হইতে ইংরাজি জানা লোকের দ্বারা ইংরাজিতে টাইমটেবল জাপানের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান এবং সৌন্দর্য কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে লেখা বই ও মানচিত্র ইত্যাদি তৈয়ারী করাইয়া বিদেশী যাত্রীদের free দেয়। তা'ছাড়া বিদেশীদের টিকিট কেনা, মালপত্র বুক করা, tour programme তৈয়ারী করার কাজ এই ব্যুরো করে। এখানে যে সমস্ত কর্মচারী আছে তারা সকলেই ইংরাজি জানে, তা ছাড়াও আরও দুই একটি ইউরোপের ভাষা জানে। এই জন্য বিদেশাগত লোকদের জাপানে পরিভ্রমণ করা খুব সুবিধা।

দশটার সময় কোবেতে ট্রেনে উঠিয়া বেলা ১টার সময় কিওটোতে নামিলাম। নামিয়াই ষ্টেশনের সামনে একটি জাপানী হোটেলে আশ্রয় লইলাম। জাপানের একটা বিশেষত্ব আমি লক্ষ্য করিয়াছি, যে ইহারা প্রকৃতিকে খুব ভালবাসে। যতই গরীব হউক না কেন, বাড়ী ছোট হউক না কেন, অন্ততঃ দুহাত জমিতেও "নিওয়া" অর্থাৎ বাগান আছে এবং সেখানে দুই চারিটি ফুলের টব থাকিবেই। আমাদের হোটেলটা ছোট। তবুও সেখানে আট হাত জমিতে একটি বাগান আছে এবং সেখানে ফুলের টব ফুলভরা অনেক ছিল।

কিওটো এগার শতাব্দী ধরিয়া, ৫৫ বৎসর মাত্র পূর্বে সম্রাট বংশের পুনরুদয় পর্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল। ইহা সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল অংশে অবস্থিত —স্থানটি বহু ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য জাপানে বিখ্যাত।

নগরীর পূর্বদিকে সারি দিয়া পাহাড় ধীরে ধীরে চলিয়াছে ; দূরে সমতল ভূমি পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। এখানে রাস্তাগুলি পরস্পর আড়াআড়ি ভাবে কাটাকাটি করিয়াছে, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে কামোগায়া নদী পূর্বাংশ স্নাত করিয়া বহিতেছে। পাহাড়ের সানুদেশে ধারে ধারে অনেকগুলি মন্দির দেবালয় ও অন্যান্য সৌধশ্রেণী বেশ মনোহর ও বর্ণনীয় বটে, আরও অনেকগুলি শহরতলীর মধ্যেই ও উপনগর সমূহেও আছে।

৭৯৪ অব্দে সম্রাট কোয়ামু কর্তৃক এই স্থানটি নির্বাচিত হয়। এইখানে তিনি রাজভবন স্থাপন করেন। সহরটির গঠন তদানীন্তন চীন রাজধানীর আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছিল। আর সহরটি আগে এখনকার চেয়ে বড়ও ছিল, এবং উহাই দেশের সভ্যতা গৌরবের কেন্দ্র এবং রাজপরিষদ ও নাগরিকগণের বিলাস বৈভব ও আমোদ-প্রমোদের অদ্বিতীয় উৎসব ক্ষেত্র ছিল। যখন রাজশক্তি জাপানের ক্ষত্রবংশ সামুরাই-গণের হস্তে আসিয়া পড়িল, কিওটো কত যুদ্ধ, রক্তকাণ্ড, অগ্নি ও হত্যালীলার অভিনয় স্থল হইয়াছে ; এই নগরীর ইতিহাস কাহিনী সমগ্র জাপানের মধ্য যুগের ঐতিহাসিক জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। কিওটো এক্ষণে জাপানের তৃতীয় মহানগরী এবং ইহার জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচলক্ষেরও উপর। ইহা পাড়ের কাজ চীনামাটি, প্রভৃতি কারুশিল্প ও শ্রম-শিল্পের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

হোটেলে একটু বিশ্রাম করিয়া সহরটা দেখিতে বাহির হইলাম। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত সহরটি এবং সেখানকার প্রধান প্রধান দেখিবার জিনিষ দেখিয়া ফিরিলাম। এখানকার একটা নিয়ম আছে, যে আগন্তুকের নাম, ধাম ইত্যাদি হোটেলে লিখিয়া রাখে। আমার নামটা একটু এখানে বদলাইলাম। Tagoreটাকে Thakore করিলাম। পাঠান দুটিকে বুঝাইলাম যে, বাঙ্গলাতে আমরা "ঠাকুর" লিখি, কাজেই এখানেও সেই ভাবেই থাকাটা ঠিক।

পরদিন সকালে ৭টার গাড়ীতে টোকিও অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ীখানি সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেন, প্রায় সমস্ত ষ্টেশনে দাঁড়াইতেছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমরা ৩ জন ছাড়া আর কোনও যাত্রী ছিল না। কিছুক্ষণ পরে গার্ড টিকিট দেখিতে আসিল। জাপানের ট্রেন ভারতের ট্রেনের মতন নয়। গার্ডের গাড়ী থেকে এঞ্জিন পর্যন্ত গাড়ীর মধ্য দিয়ে যাইবার ব্যবস্থা আছে। গার্ড ইংরাজি জানিত। জাপানের প্রধান মেল, এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গার্ডেরাই ইংরাজি জানে। তাহার সঙ্গে রাজনৈতিক এবং অন্যানা অনেক কথাই হইল। টোকিও ষ্টেশনে না নামিয়া তাহার পূর্বে শীমাবাশী ষ্টেশনে নামিলে সেখানে অনেক হোটেল আছে, একথাও তাহার কাছ থেকে জানিলাম। আমরা এ পর্যন্ত টোকিওতে যে অনেকগুলি ষ্টেশন আছে, তাহা জানিতাম না।

আমরা রাত্রি ১১টার সময়ে শীমাবাশী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। গাড়ী থেকে নামিয়া টিকিটটি দিয়া বাহিরে আসিলাম। কি করিব ? জায়গাও চিনি না। এখানকার ভাষাও জানি না। ইতিমধ্যে দেখি যে একজন পুলিশ আমাদের দিকে আসিতেছে।

ভাবিলাম পুলিশ আবার কেন আসে ? সে আসিয়া একটি নমস্কার করিয়া, ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিল, যে আমরা কোথায় যাইব।

আমাদের অবস্থাটা তাকে বুঝাইয়া কহিলে, বেচারী আমাদের সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ একটি হোটেলে গেল। দরজা বন্ধ, অনেক ডাকাডাকির পর একজন লোক দরজা খুলিল। আমরা বিদেশী, আমাদের সে রাত্রে আশ্রয় দেবার জন্য বলিল। হোটেলের লোকটি আমাদের সঙ্গে করিয়া উপরের একটি ঘরে লইয়া গেল। পুলিশটিও আসিল। সে একটি কাগজে ইংরেজিতে এবং তার পাশে Roman character-এতে নিম্নলিখিত শব্দগুলির জাপানী লিখিয়া দিল, কাগজে লিখিল—water closet, water, food, eggs, bread, milk, tea, coffee.

আমাদের কোনও কষ্ট না হয়, খুব যত্ন করিবার জন্য বলিয়া সে আমাদের জন্য এত করিয়াছে ভাবিয়া তাহাকে ৫০ সেন্ বক্সিস করিতে গেলাম। সে মহা খাপ্পা। সে বুঝাইয়া দিল, যে আমরা ভারতবাসী, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের দেশের লোক, সেইজন্য আমাদের সেবা করিতে সে আসিয়াছে। সে টাকার জন্য আসে নাই। বুদ্ধ তাহার 'কামী' অর্থাৎ ভগবান, তাহার দেশের লোক বলিয়া সে এবং অন্য সমস্ত জাপানী আমাদের ভায়ের মত ভালবাসে।

এই কথাটা শুনিয়া হৃদয়ে একটা বেশ আনন্দ হইল। ভারতীয়কে ভালবাসে এমন জাত পৃথিবীতে আছে এই প্রথম জানিলাম এবং পরে এই কথার যথেষ্ট প্রমাণও পাইয়াছি।

আজও যে আমি বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ এখনও জাপান ভারতকে এবং ভারতের ঋণ ভুলে নাই বলিয়া। কপর্দকহীন, বন্ধুহীন, বিদ্যা-বুদ্ধিহীন হইয়াও আমার মতন অকেজো এবং অপদার্থ একজন যে এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই, যে পূর্বে ভারত জাপানকে যে জিনিষ দিয়াছিল তাহা জাপান ভুলে নাই এবং কখনও ভুলিবে বলিয়া বোধ হয় না। আজও ভারতবাসী এখানে সম্মান পায়।

কিন্তু চরিত্রহীন এবং Europeanised ভারতবাসীদের জন্য বুঝি বা ভারত এ সম্মান হারায়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে জাপানে যে সমস্ত ভারতবাসী আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই চরিত্রহীন এবং অশিক্ষিত। এদের অনেকেই মদ্যপ এবং ব্যভিচারী। এদের জন্য সমস্ত ভারতের বদনাম হইতেছে। আর এক প্রকার লোক যারা জাপানকে ভারতের সম্বন্ধে কু-ধারণা দিচ্ছে, তারা Europeanised Indians। তারা দুটা ইংরাজি লিখিতে এবং বলিতে পারে বলিয়া জাপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং জাপানীদিগের সঙ্গেইংরেজ এবং আমেরিকানরা যে রকম ব্যবহার করে সেই রকম ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের মধ্যেও কখনও কখনও এই ভাবটা দেখা যায়। জাপানের রাজনীতির সম্বন্ধে অনেক সময় অমূলক এবং অবিশুদ্ধ প্রবন্ধ লেখা থাকে। তাহার কারণ অবশ্য ইংরাজদের Propaganda। ইহাদের

কারচুপিতে এঁরা প্রতারিত হন। 'Japs' কথাটি আমেরিকানরা বানাইয়া লইয়াছে। আমেরিকানরা ঘৃণা প্রকাশ করিবার জন্য জাপানীদের 'জাপ' বলে। জাপানীরাও ইহাতে খুব চটে। কিন্তু আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও দেখিয়াছি অনেক সময় এই কথাটি ব্যবহার করেন। এই সমস্ত কারণে ভারতের অনেক ক্ষতি হয়।

সে রাত্রে সেখানে থাকিয়া পরদিন একজন ভারতবাসীর খোঁজে বাহির হইলাম। এধার ওধার খুঁজিয়া একজনকে পাইলাম। হোটেলে থাকায় অনেক খরচ। তিনজনে উপস্থিত একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া ঠিক করলাম। এখানকার—দেশ ভাইটিকে সঙ্গে করিয়া অনেক খুঁজিয়া মাসিক ১৪ ইয়েন ভাড়ার একটি বাড়ী পাইলাম।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

জাপানের নীরব কর্ম্মী
মিৎসুরু তোয়ামা[1]

[জাপান প্রবাসী লিখিত]

জাপান স্বাধীন দেশ। জাপানী বীরজাতি—স্বাধীনতা দেবীর উপাসক প্রিয় সন্তান। এই জাপান জাতির মধ্যে সামুরাই নামক এক যোদ্ধৃ সম্প্রদায় আছে—উহারাই জাপানের অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়। মিৎসুরু তোয়ামা এই ক্ষত্রিয় কুলজাত এক প্রসিদ্ধনামা বীরপুরুষ; ইঁনি বর্তমান জাপানের একজন অসাধারণ প্রতাপশালী মহাকর্ম্মী, অর্থ প্রভাব ও কীর্তিমাত্র পুরোভাগে রাখিয়া, তিনি আজীবন জন্মভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন, জাপানেও খুব অল্প লোকেই তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন...কিন্তু মিৎসুরুর নাম দেশবিশ্রুত। মহামন্ত্রী হইতে পথের কুলিমজুর পর্য্যন্ত আপামর সাধারণ সকলেই মিৎসুরুকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ করে...সহস্র সহস্র ব্যক্তি শুধু তাঁহারই জন্য ইঙ্গিতে মাত্র প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কাতর নহে—বাস্তবিক মিৎসুরু তোয়ামা বর্তমান জাপানের অদৃশ্য মহাপুরুষ, তাঁহার অঙ্গুলী হেলনে জাপানের রাষ্ট্রীয় জীবনে 'হয় নয় ও নয় হয়' হইয়া যায়। জাপানের ভাগ্য-বিধাতৃগণের মধ্যে এই নীরব স্বদেশ সাধক বীরকর্ম্মী এক অন্যতম শক্তিকেন্দ্র।

১৯১৫ সালে,[2] ভারতের বিপ্লবনেতা রাসবিহারী যখন নিরাড়ম্বরে জাপানে উপস্থিত হন, তাহার অনতিকাল পরে এই সংবাদ পাইয়া বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট জাপান রাজসরকারের নিকট প্রার্থনা জানান—রাসবিহারীকে জাপান হইতে নির্ব্বাসিত করা হউক। তখন এই শক্তিমান্ স্বাধীনতাপ্রেমিক তাঁহাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করেন। অদ্যাপি মহাপুরুষ তোয়ামা চৈনিক বিপ্লবকর্ম্মী ও অন্যান্য ভারতীয় নির্ব্বাসিতদের তত্ত্বাবধান করেন। প্রথমে রাষ্ট্রবিপ্লবে চীনের মুক্তিদাতা ডাক্তার সান ইয়েতসান যে বিজয়লাভ করেন, তোয়ামার সহায়তাই তাহার এক প্রধান কারণ। তোয়ামা সমস্ত এশিয়ার মহামুক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের একটি শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খা এই, মহাত্মা শাক্যসিংহের পুণ্য জন্মক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ ভারতবর্ষ অচিরে পরাধীনতার বন্ধনমুক্ত হইয়া উঠিবে, এবং তখনই তিনি এই মহাতীর্থ সন্দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবেন। তোয়ামার মনোসাধ কি সত্যই অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে না ?

এই তোয়ামা কে ? এই অদ্ভুতকর্ম্মা, অদৃশ্যধর্ম্মা জাপানের ক্ষত্রবীর, বিপন্নের আশ্রয়, নীরব কর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ—কি তাঁর ইতিহাস, কি তাঁর চরিত্র ? জাপানের যুগ-সাধকদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন, সত্যই আলোকসামান্য চরিত্রগুণে যাঁহাদের সমতুল্য ব্যক্তি অন্যান্য স্বাধীন জাতির মধ্যেও দুর্লভ। ইঁহারা জাতীয় সাধনার মর্ম্মানুধ্যানে বিভোর হইয়া সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, ও তাহার ফলে দেশ

সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও দুঃসাধ্য কর্ম্মেও পশ্চাৎপদ হন না। চরিত্রে ও কর্ম্মে অসাধারণ এইসকল দেশকর্ম্মীদের "সোশী" অর্থাৎ বীর এই নামেই অভিহিত করা হয়—ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের কবির এই কথা খুবই খাটে—"আগুন মোদের খেলার জিনিষ মৃত্যু মোদের পায়ের দাস"। ইহারা নেঙটা মুক্তিনামীর দল—শাসকতন্ত্রকে পর্য্যন্ত ইঁহাদের ভয়ে সশঙ্ক থাকিতে হয়। মিৎসুরু তোয়ামা এই খাপখোলা মুক্তিসেনা দলেরই একজন বিশিষ্ট নেতা ও আদর্শ কর্ম্মী। ইঁহাকে বিভিন্নজনে কেহ প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে, কেহ বা শঙ্কা ও সংশয় মিশাইয়া দেখিয়া থাকেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, দক্ষিণ জাপানে চিকু প্রদেশের ফুওকোকায় তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যাবধি মিৎসুরু খুব দুরন্ত স্বভাব, কনফুশিয়ান পণ্ডিত যোশু কামাই'এর পাঠশালায় তাঁর প্রথম হাতে খড়ি হয়, কিন্তু লেখাপড়ায় তিনি বরাবর স্বেচ্ছাচারবর্ত্তী ছিলেন; তবে রচনা লিখনে তাহার সহপাঠিদের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সমাধ্যায়ী ছাত্রগণ অল্পবয়স্ক তোয়ামাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিত, গুরু যোশু কিন্তু তাহাদের এই উপেক্ষা সমর্থন করিতে না পারিয়া প্রায়ই বলিতেন—না, এই বালক একদিন বড়লোক হইবে ও খুব বড় কাজ করিবে। সেকালের জাপানের বালবিদ্যালয়ে স্পার্টানদের মত কঠোর শৃংখলা ও সংযমপূর্ণ শিক্ষাসাধনা ও ক্ষত্রবিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল—সুস্থ দৃঢ় শরীরে সবল শক্তিশালী মন গঠন করাই তাহাদের আদর্শ। অন্যথা প্রাণহীন জড় সংস্কারে হীনস্থা হইয়া তাহারা মুক্তিমন্ত্রেরই উপাসনা করিত।

তোয়ামার পিতৃদত্ত নাম—ওটোকিচি; কিন্তু তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়ক্রম কালে, 'তেনমান' দেবমন্দিরে উপনীত হইয়া, তিনি তার প্রবেশদ্বারে একটি নাম খোদাই দেখিয়া, তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উক্ত নামের অনুযায়ী তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের নাম পরিবর্তিত করিয়া মিৎসুরু রাখিলেন। এই দেবমন্দিরটি জাপানের প্রসিদ্ধ জাতীয়বীর সুগাওয়ারা মিকিজেনের নামে উৎসর্গীকৃত: এইরূপে বাল্যাবধি সেই দেশবীরের পুন্য প্রেরণা আদর্শ করিয়া তোয়ামা আত্মজীবন গঠনে কৃতসংকল্প হইলেন। বিদ্যালয় বালক তোয়ামা স্বাধীনতাপ্রিয় ও অতীব দুঃসাহসিক ছিলেন। একবার কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মনস্থ করিয়াছিল, তোয়ামা ইহা শুনিতে পাইয়া একটি কথাও বলিলেন না। তিনি শুধু কোমরে ছুরিখানি ঝুলাইয়া যথারীতি কাজকর্ম্মে নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার এই গম্ভীর বিজ্ঞজনোচিত নীরবতা অন্যান্য সকলকে এমনি মুগ্ধ ও অভিভূত করিল যে আর তাহারা তাঁহাকে কিছুই বলিতে সাহস করিল না। তোয়ামা 'জেন' নামক বৌদ্ধ সম্প্রদয়ের সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসি-বিদ্যা ও জুডো ব্যায়ামে আসাধারণ নৈপুণ্য অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

উনবিংশবর্ষ বয়সে তোয়ামা জাতীয় ব্যাপার সমূহের চর্চায় অনুরক্ত হইলেন। তখন জাপানে ঘোরতর পরিবর্তনের যুগ। চারিদিক অশান্তিময়। রাজকর্তৃপক্ষগণের মধ্যে কোরিয়া আক্রমণের চিন্তা আলোচনার তুফান তুলিয়াছে, ও সেই সূত্র ধরিয়া

শাসক সম্প্রদায়ে দুই দল দেখা গিয়াছে। মহামতি সেগো তখন শাসনপরিষদের একজন মন্ত্রী ; তিনি রাজকার্য্যের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সৎসুমায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ন্যায়-মন্ত্রী শিমপেই ইটো ও অন্যতম পারিষদ্ ইশেই মেয়েবারা ইঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তোয়ামা সেগোর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন ও বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের আবেগে তাঁহার নেতৃত্বের নির্দ্দেশ স্বীকার করিয়া চলিতেন। সুতরাং ১৮৭৬ সালে তিনি বন্ধুবর্গ লইয়া 'কিস্তু শিনসো' নামক দেশসেবক সমিতি স্থাপন করিলেন—উহা একটি প্রতাপশালী রাষ্ট্রদল হইয়া উঠিল ও মতে একান্ত চরমপন্থী, গভর্নমেণ্টের বিরোধী হইল। এই দলের কয়েক-জন সভ্যের সহিত গভর্নমেণ্ট পক্ষের সংঘর্ষ বাধিল ; কেহ কেহ সেগোর প্রতিপক্ষ রাজমন্ত্রী ওকুবো'র জীবননাশের গুপ্ত চক্রান্তও করিল। এতদ্‌সম্পর্কেই তোয়ামা ধৃত হইলেন। তাঁহাকে এক বৎসর কারাযাপন করিতে হইল। সেগোর অনুচরবৃন্দের উদ্যোগে যে বৎসর সৎসুমায় বিদ্রোহের সূচনা হয়, সেই বৎসরই তিনি মুক্তিলাভ করেন। তোয়ামা এই বিদ্রোহের পরিণামে কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়েন, এবং অচিরাৎ দক্ষিণ জাপানে, টোসা নামক স্থানে গিয়া ভূতপূর্ব কাউণ্ট ইটাগাকীর সহিত আর একটি বিদ্রোহচেষ্টার জন্য পরামর্শ দিলেন ; কিন্তু ইটাগাকী বলিলেন, সেগোর ন্যায় মহাকর্ম্মী যে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলেন, তাহাতে তাঁহার চেয়ে ছোট মানুষদের সফলতার আশা করা দুরাশা মাত্র। তোয়ামা তাঁহার কথার সারবত্তা স্বীকার করিয়া, উভয়ে মিলিয়া এক নতুন রাজনৈতিক সমিতি স্থাপনপূর্ব্বক গভর্নমেণ্টের ধ্বংস প্রয়াস করিবেন—ইহাই স্থির করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক শাসন-বিধান বিধ্বস্ত করিয়া, আমলাতন্ত্র ও সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করা।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তোয়ামা "জেন-ইয়োষা" এই রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন ; ইহার প্রথম নীতি হইল—সম্রাট বংশের উপর অখণ্ড শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় নীতি সাম্রাজ্যের প্রতি ভক্তি এবং তৃতীয়, প্রজাপুঞ্জের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সম্যক রক্ষণাবেক্ষণ করা। অত্যল্প কালের মধ্যেই এই সমিতির প্রায় ১০,০০০ সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। তোয়ামা সমিতির নামতঃ সভাপতি না হইলেও, তিনিই ইহার কার্য্য-কলাপ সমূহের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সভ্যগণের সকলকেই ইংরাজী ও চীনা সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহাছাড়া আইন, যুদ্ধ বিদ্যা ও বিশেষ করিয়া 'জুডো' শিখিতে হইত। দেশের জন্য তাহারা সদাসর্ব্দা প্রস্তুত থাকিত।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব বৈদেশিক মন্ত্রী মার্কুইস ওকুমা যখন বিদেশীয়-গণের বিচার ব্যাপারে, জাপানী ধর্ম্মাধিকারীর পাশাপাশি বিদেশীয় বিচারকদিগকেও স্থান দিতে চাহিলেন, জেন-যোশা সমিতির সভ্যগণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া, জাতির পক্ষে এই ঘোর অপমানজনক ও সাম্রাজ্যের শ্রদ্ধাহানিকর ব্যবস্থা যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিছুদিন পরেই, ওকুমার প্রতি বোমা নিক্ষেপ করা হইল, মন্ত্রী তাহাতে একটি পা হারাইয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। স্বদেশপ্রেমিক গুপ্তঘাতক সুনোকি কুরুশিমা তোয়ামারই দলের

লোক, অকুস্থলেই সে 'হারিকিরি' করিল—এইরূপে শাসনভার পতনের দিন আরও ঘনাইয়া আসিল। স্বয়ং তোয়ামা সংশয়বশে ধৃত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায়, তিনি মুক্তি পাইলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাৎসুকু শাসন-সভা যখন নৌবহর বৃদ্ধির আয়োজনে চেষ্টা পাইলেন, মন্ত্রী সাম্রাজ্য সংসদের (Imperial Diet) সম্মতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর বুঝিয়া, সাধারণ নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিয়া, সংকল্প সাধন করিবেন, স্থির করিলেন। এই কার্য্যে তিনি তোয়ামার সাহায্য চাহিলেন। ইনি যদিও গভর্নমেণ্টের প্রতি সুনজরবিশিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু বৃহৎ নৌবহরে তাঁহার বিশ্বাস থাকায়, তিনি সাহায্যদানে সম্মত হইলেন। তোয়ামা তাঁহার আজ্ঞাকারীগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া দেশব্যাপী নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতে বলিলেন —ফলে নির্ব্বাচনযুদ্ধ বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল।" "শোশা" অর্থাৎ বীরগণ দলে দলে সর্ব্বক্ষেত্রে, এমন কি টোকিওতে পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইয়া নির্ব্বাচনে গভর্নমেণ্টের সহায়তা করিল। সেই বৎসর গবর্নমেণ্টেরই জয় হইল। এই ঘটনায়, তোয়ামার অদ্ভুত প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট রকমেই পাওয়া গেল।

ইহার অচিরকাল পরে, কোরিয়ায় বিদ্রোহ ঘটিল। কিমওইকুন নামে সম্ভ্রান্তবংশীয় একব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মে সহায়তা পাইবার আশায় জাপানে পলায়ন করিলেন। অবশ্য জাপানে গভর্নমেণ্ট, চীন ও রুষিয়ার ভয়ে এরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইলেন, কিন্তু কিম সাহায্য ও আশ্রয় পাইলেন তোয়ামা ও তাঁহার দলের, প রশেষে কিম জনৈক কোরিয়ান্ গুপ্তচরের প্ররোচনায় সাংঘাইয়ে নীত হইলেন, সেখানে তাঁহাকে গুপ্তভাবে নিহত করা হইল এবং জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া সতর্ক করার ছলে, তাঁহার মৃতদেহ প্রকাশ্যে কোরিয়ায় সকলের সম্মুখে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তোয়ামা কোরিয়ানদের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের ও চীনের উভয়ের শাস্তি বিধানের জন্য মতলব আঁটিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি বহুসংখ্যক লোক পাঠাইলেন, কোরিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি ও চীনের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য। তাহারা তাগাকুটো নামে দল বাঁধিয়া কোরিয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটাইল এবং জাপান ও চীন উভয়কেই সৈন্যপ্রেরণ করিতে বাধ্য করিল—উহাই পরিণামে ১৮৯৪ সালের চীন জাপান যুদ্ধে দাঁড়াইল। তোয়ামার এই কার্য জাতীয় ইতিহাসের একটি মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় ও জাপান ইহার জন্য তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় মাকুইস্ ওকুমা কাউণ্ট ইটাগাকীর সহযোগিতায়, তাঁহার প্রথম দল-তন্ত্র শাসন-পরিষদ গঠনকালে, তোয়ামার অসাধারণ প্রতিপত্তি স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে একটি সদস্যপদ গ্রহণ করিতে উপযাচকতা করেন। ইহা ওকুমার পক্ষে বিশেষ উদারচিত্তেরই পরিচয়, কারণ তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন যে তাঁহার জীবননাশের চক্রান্তে তোয়ামারও হাত ছিল। ডাঃ হাটোয়ামা তোয়ামার নিকট সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব লইয়া গমন করেন, এবং পনের বার তাঁহার দুয়ারে বসিয়া প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্তু তোয়ামার গোঁ ভাঙিল না, তিনি দৃঢ়স্বরেই সেই

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, যে তিনি ত কোনও দিনই রাজ-কর্ম্মচারী হইতে চাহেন নাই, কারণ যে কোন রাজপদের চেয়ে তাঁহার ঢের বেশী ক্ষমতা আছে। তাঁহার একমাত্র জীবনের আকাঙ্খা—দেশের সেবা করা, এবং তাঁহার মনোগত ইচ্ছা এই যে, তিনি যশোলিপ্সা বা পদমর্য্যাদার লোভ না রাখিয়াই এই দেশসেবায় আমরণ প্রবৃত্ত থাকিবেন।

১৯00 খ্রীষ্টাব্দে, স্বর্গগত প্রিন্স ইটো যখন শেইযুকেই দলের কর্তৃত্বাধীনে শাসন সংসদ গঠন করিলেন, তিনি তোয়ামাকে আবার সদস্য হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তোয়ামা এবারেও তাহা সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, জাপানের রাজনীতিকগণ তোয়ামার অপ্রতিদ্বন্দী ক্ষমতার বিষয় কতখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ও সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছেন। চীনের বৈপ্লবিক সময় ঘোষণার পর, অধিকাংশ বিদ্রোহ-নেতৃগণ জাপানে আশ্রয় ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পলাইয়া আসেন, এবং প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইতেও হয় নাই। তোয়ামার নিজেও দক্ষিণ চীনে গিয়াছিলেন—তাঁহার যাওয়ার ফলে, বিদ্রোহীগণের প্রাণে যথেষ্ট নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। বলিয়াছি, আজও তোয়ামা নিরাশ্রিতের আশ্রয়দাতা ও সকল দেশের বিপ্লবসাধকদের নির্ভর ও সাহায্যস্থল। তাঁহার উদারবক্ষে বিপন্ন জাতির প্রতি সহানুভূতি ও মুক্তিকামনা ভারতবাসীকেও যে ব্রত সাধনে সহায়তা ও রক্ষা করিয়াছে, তাহার জন্য সমগ্র ভারতবাসীই তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে ঋণবন্ধ থাকিবে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

বস্তুতঃ তোয়ামা একজন অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ, কিন্তু তাঁহার জীবনে ও আচরণে কোনই বাহ্যাড়ম্বর নাই। নীরবে, বিরলে তিনি কাল যাপন করিতে ভালবাসেন, আপাতদৃষ্টে মনে হয় যেন তাঁহার জীবনে কোন কাজকর্ম নাই। নীরবধর্ম্মী মানুষ তিনি, খুব স্বল্পবাক্ ও মন্ত্রগুপ্তি-পরায়ণ। জাতীয় হিতাহিত সম্পর্কিত বড় বড় রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সমস্যা লইয়াই তিনি চিন্তা করিতে ভালবাসেন এবং তাহারই সমাধানকল্পে আপনাকে সতত প্রস্তুত রাখিয়াছেন। প্রাধান্য প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা সত্যই তিনি কোনও দিনই করেন নাই, কিন্তু তথাপি জাতীয় জীবনে তাঁহার প্রভাব সর্ব্বব্যাপী এবং তাঁহার সহিত তুলনায় আরও বিখ্যাত পদবীর লোকগণের সকলের চেয়ে তাঁহার প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অনেক বেশী। তোয়ামা গম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক, তাঁহার সহিত আলাপে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় ও তাঁহার মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার নাম শুনিয়া যে অলৌকিক প্রভাব বিমুগ্ধ ও অভিভূত করে, তাঁহার চেহারায় তাদৃশ সম্ভ্রমোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার হৃদয়ের অপার সহানুভূতি দরিদ্র ও দুর্ভাগ্য লোকসাধারণের প্রতি বৃষ্টিধারার ন্যায় করুণাপ্লাবী। জাতীর উন্নতিসাধনার জন্যই তাঁহার সঞ্চিত অর্থসম্পত্তি হস্তগত হওয়া-মাত্র ঢালিয়া দেওয়া তাঁহার স্বভাব—দেশমঙ্গলের অসংখ্য পরিকল্পনা মাথায় ভরিয়া তিনি সর্বদাই উম্মত্ত আছেন।

টোকিওতে তোয়ামার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে একজন, ভাইকাউণ্ট মিউরা, ইনি প্রিভী কাউন্সিলার—তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলেন—যে তোয়ামা কখনও কোনও জাতীয় সমস্যা লইয়া তর্কাতর্কি করেন না; কিন্তু মীমাংসার জন্য প্রশ্নগুলি উঠিবামাত্র তিনি দৃঢ় সঙ্কল্পপূর্ণ হৃদয় লইয়া উহাদের সম্মুখীন হন এবং আপ্রাণ শক্তি প্রয়োগে এক একটি আশ্চর্য্য ঘটনাপাত করিয়া তাহাদের সমাধান করেন। প্রথম দর্শনে মনে হয় যেন তোয়ামা বড়ই নির্ব্বুদ্ধি ও প্রতিভাশূন্য, দ্বিতীয় সাক্ষাতে বোধ হয়, তাঁহার মন যেন উদাসীন ও অভিনিবেশ দিতেছে না; তৃতীয়বারে, তাঁহার অন্তরের মহত্ব উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্ত, প্রতীয়মান হইয়া উঠে। তোয়ামা যদি জাপানের প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের মানুষ হইতেন, তিনি বড় কোনও দুর্গাধিপ হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ মিৎসুরু তোয়ামা জাপানের নবযুগের অলক্ষ্য শক্তিকেন্দ্র মহাপুরুষ জাতি-সাধনার এক নীরব বিদ্যুন্মূর্ত্তি মহাকর্ম্মী।

(১) মূল ইংরাজী লেখাটি The Standard Bearer পত্রিকায় (June 27, Vol. 1. No. 2. Page 108] প্রকাশিত হয়েছিল এই শিরোনামায়

MITSURU TOYAMA

(The Unseen Man of Japan)

By—Rash Behari Bose

(২) মূল ইংরাজী লেখায় ছিল ঃ

In 1915, when I reached the Shores of Japan, the British Government at once conveyed the news to the Japanese Government, and asked for my extradition. At that critical juncture, it was this redoubtable lover of freedom, who gave me shelter in his house and saved my life. Still to this day, the great Toyama looks after the interests of Chinese and Indian revolutionaries who flock to Japan. During the first political revolution in China. the late Dr. Sun Yat Sen, the leader of the Chinese national movement, received valuable assistance from his silent ally, Mitsuru Toyama, who largely contributed to his success. Mr. Toyama has dedicated his life to the emancipation of all Asiatic peoples. One of the highest aspirations of his heart is to see India, the holy birthplace of the great Buddha, once more liberated from bondage. He still cherishes the idea of coming as a Pilgrim to pay homage to India, when she will be free.

(৩) মূল ইংরাজী লেখা :

In 1890, when Marquis Okuma, the foreign minister, offered to appoint alien judges side by side with Japanese judges in connection with the trial of foreign subjects, the members of the "Gen-Yosha" Society flew into intense rage and excitement, and resolved to oppose a proposal, so insulting and derogatory to the prestige of the Empire.

THE NATIONAL AWAKENING OF CHINA

By—Rash Beharl Bose

China is up and doing. She has awakened from her torpor. She in marching forward with great strides. And if she can maintain her present progress, her success is assured. Chinah as reached the present stage by passing through various processes of national awakening.

Three fairly distinct stages in the nationalistic awakening of China can be traced. During the earlier years of republic, that is upto 1919, the awakening was confined largely to the student and more intellegent merchant classes of China. The high points in this period which roused feeling in a national way were the Twenty-one demands of Japan and the Versailles peace treaty While the central government remained powerless on both occasions, the students and merchants of the country combined in an economic boycott of Japan as a protest against the Twenty-one demands and in a national strike to compel the Chinese peace delegation in Paris to withdraw from the conference as a protest against the settlement of the Shantung question.

From 1919 to 1925, the awakining entered its second stage when the labouring clases of China were reached. Beginning from south China, the tide of nationalism swept steadily northward through the ranks of labor. From an incoherent mass, habor in China today has become a powerful group to be reckoned with in any national crisis. The two events which stood out in this period as rallying points in the consciousness of the people were the seamen's strike of Hongkong in 1923 and the May 30 shooting affair of Shanghai in 1925. Both events served to intensify and deepen the already growing national conciousness of the Chinese people, particularly in the ranks of labor.

It was during this period that the Russian influence began to be felt in China. Russia, posing as the only country ready to deal with

China as an equal, was welcome by Dr. Sun Yat Sen and his followers, and Russian advisers were appointed to the most important departments in the Southern Government. The Russian contribution to the nationalist's cause lies chiefly in adding method and experience in party organization and propaganda to the enthusiasm of the nationalists.

With May 30, 1925, the nationalist awakening reached its third stage when it entered another stratum of Chinese Society, namely, the farm-workers. During the past year, farmers' union have sprung up rapidly in south China and the movement promises to spread to the other provinces whenever they came under the influence of the nationalist government. It is yet too early to estimate the power and strength of this group when thoroughly awakened to a sense of nationhood, but anyone with even a limited understanding of conditions in China will readily see the vast significance in this stage.

The political expression of the nationalist movement is the Kuomingtang, or People's party. This party was originally founded by Dr. Sun Yat-sen as a secret organization for the purpose of overthrowing the Manchu regime. Through thick and thin, this party has tried to preserve the ideals of the revolution. During the first years of the republic, it opposed Yuan Shih-Kai's efforts to abolish the parliament and suspend the constitution. Defeated in this struggle, the leaders went down to Canton and established an indepedent Government from Peking. Through many vissititudes of fortune, this Government has developed into the present nationalist government.

The Nationalist Program

The chief source of strength of Knomingtang at the present time lies in the fact that it is the only political party which has even the semblance of a constructive national program of three main sections, namely, the political unification of China under the authority of a nationalist government, the readjustment of China's international treaties, and the betterment of the condition of hand-workers. With such a program, Kuomingtang has given voice to the

nationalistic sentiment and as a result the northern drive sueceeded beyond the wildest hopas of its originators. Today, the territory under the control of the nationalist government embrace the provinces of Kwangtung, Kwangsi, Kweichow, Fukien, Hupeh, Kiangsi, Shensi and Kansu.

Opposed to the nationalist government, we find three military fractions. First and most powerful, comes the Mukden group under the ledership of Chang Tso-lin which at presnt controls Manchuria Chili and Shantung. Secondly, we have the group under the leadership of Sun Chaum-fang which controls Kiangsu, Cheking and Anhui. The third group is known as Chihli party with General Wu Pei-fu as the leader. This fracrion has Honan under its control. Outside of these three groups, there are Shansi under Governor Yen and Yunnan under Governor Tang, both of whom are maintaining an attitude of watchful waiting. Szechuen is claimed by the nationalist government but its real status is still uncertain. Cotrasted with Kuomingtang, these military groups have no program of any kind except unification by military force, They are morally hated by the people and their elimination is simply a question of time.

The Communists

Even since the influx of western ideas into China, communism has had a small band of followers in the ranks of the intelligentsia. But the group has remained small and unimportant because of the innate aversion of the chinese people to radical ideas of social organization. When the kuomingtang grew in importance and size and in the favour of the people, it led to a desire on the part of the communists to throw in their lot with the Kuomingtang, so that under cover of the political influence of that party, they eould propagate and put into practice communistic ideas and principles. The kuomingtang, on the otherhand, lacked organization and it was felt by the leaders that an influx from the communistic group would be a great asset to their own party machine and spirit. Accordingly, a union of the two was consummated soon after 1921. The division of labor between these two groups seemed to be that the political program of the party is to be in the hands of the

Kuomingtang leaders while the propandist activities are to be in the hands of the communists.

The influx of communistic members into the Kuomingtang, has resulted in a sharp division in the rank and file of the party. Those followers of Dr. sun who are moderates and not sympathetic to eommunistic ideas are known as the 'rights' while the extremists and communists are known as the 'lefts'. Just at present, the lefts are in the ascendency in the party.

The left wing of the party has gained a strong foothold among students through the student unions and among laborers through the student unions. It is just begining to organize the farmworkers into unions also. Through these means, the left wing has gained tremendous power in the party and the moderates are powerless to overthrow this group for fear that it will so shake and disrupt the whole fabric of the party as to endanger the nationalist movement in China. And so the activities of the left wing are tolerated by the party as a whole, and for the same reason, tolerated by the people at large. It is therefore quite wrong to say that China has become communistic. The real situation is that a communistic wing in the Kuomingtang is at present tolerated for the sake of the larger issue, namely, the successful prosecution of the nationalist movement.

[Reproduced from The Standard Bearer, May 1927, Vol 1, No. 1 pages 36—38]

ANACHRONISTIC ADMIRATION

Sj—Rash Behari Bose writes from Japan

His Imperial Highness Prince Chichibu, second son of the late Emperor and the brother of the present Emperor, went to England a few years ago for study at the English University.

At the time of his departure, there was a violent agitation led by many prominent Japanese leaders against his entering an English University. But the then Government did not pay any heed to the popular demand and sent the Prince to London.

Since then he had been studying there. But Last year when the late Emperor become critically ill, Prince Chichibu, wise son as he was, immediately decided to come baek to Japan to remain on the bed-side of his Imperial father. But before he could reach his country, his Imperial father breathed his last. It was understood at that time that after the funeral was over, the Prince would go back to London to prosecute his study further and at least some of the Imperial Household officials gave out to that effect.

But the Prince has decided to remain here and work for the Country. If is reported that some of the pro-British officials made attempts to send him back to England, but His highness, wise, intellegent and popular, as he is, knew that his country needed his services immediately, and consequently decided to stay here.

He has now entered the third regiment, in which he was working as an officer before he went of England.

In 1923 I was invited by the commanding officer of that regiment to deliver a lecture on India and at that time I had the honour of making the aqauintance of His Highness, who came forward and shook hands with me and heard with rapt attention what I said about the present condition of India. In this connection, the Yorodzu, a leading Japanese Daily, carried the following editorial under the Caption "Anachronistic Admiration."

THE YORODZU

The Imperial House-hold office has announced that H. I. H. Prince Chichibu has given up his plan to return to London. His Highness intends to stay on principally for the purpose of comforting his mother, now that she has lost her husband and will have to live a lonely life.

There are presumably many other reasons which prompted Prince chichibu to give up his programme of study abroad, on which we refrain from commenting for the present. We are particularly interested in the important change in national thought regarding study abroad. For many decades the Japanese people have had special admiration for Occidental culture apart from which they supposed nothing could be done to help country to go parallel with these 'advanced countries.'

This is a gross mistake. For in some sense, Occidental culture is now bankrupt. Indeed some Europeans are aware of this fact and now insist upon reconstruction of the fast decaying civillization. Such is also the case with American civillization, of which opinion is now advanced to take in Oriental life in order to perpetuate America's prosperity.

Japan has been all but fatally poisoned by the occidental civillization while it has been taken indiscriminately. We have Seen many Japanese who have wasted their precious time and money abroad only to bring back the poison of a corrupt civillization. In saying this, we donot oppose the system of sending promising young men and women to Europe or America for prosecution of study, but what we are particularly anxious about is that they ought to do so with their own country in mind. Japan has her own culture and civillization more precious than any other. She ought to have her own system and education. There ought to be more originality in all sorts of scientific investigation.



[Reproduced from the Standard Bearer, May 1927, Vol-1, No-1, Pages 55-57.]

WHAT IS NICHIRENISM ?

Japan's Militant sect of Buddhism

By—Rash Behari Bose

Nichirenism is a name given to the teachings as propounded by Nichiren the founder of the Nichiren sect of Buddhism, which cover every phase of human activity—mental, spiritual and what not. To start with, his faith is founded on Hokekyo, the Saddharma-Pundarika, the last of the Laws preached by Lord Buddha. In the Saddharma-Pundarika, the Master dispenses with his accustomed expedients or devises, each calculated to carry home the truth of his doctrine to the crowd of believers, according to their mental capacity to grasp the meaning of his preaching. Naturally, metaphors abound in his sermons, out of which grew his Scriptures.

In the Hokekyo he lays bare the foundations as well as the frame-work of his teachings ; accordingly it is a direct appeal or rather a revelation of his doctrines, which he had built up during the long course of his ministrations as Nyorai (Tathagata) . It embraced nearly a period of forty years, and it is fondly computed by the teachers of Buddhism that the Lord have as many as 84,000 Laws or Sutras. A well-known authority on the subject divides the period into five sections—the period during which the enormous amount of teaching were undertaken by Him—and all this is believed to be comprised into eight teachings. The Hokekyo transcends all these eight teachings, and stands independent of them. It is named Daigo (literally, refined milk, i. e. essence) of the Ultraeight—superseding the eight teachings above referred to

Buddha Preached Hokekyo

In the last eight years of his ministration, Lord Buddha preached the Hokekyo. He owns that hitherto there were "Three Vehicles" in his teachings, that is to say, he adopted three kinds of ways or contrivances to win over the crowd. A vehicle signifies

the method of carrying the sceptical from the boundary of doubtfulness to the opposite shore of complete faith. The sumtotal of the Hokekyo teachings is that Buddhahood is open to all living creatures Those who believe in and practise it, attain to Buddhahood ; society is a body of those who practise it ; the spiritual world is one where the spirits of Buddhas manifest themselves ; every ordinary man and woman stands as much chances as the Buddha himself to understand the Truth and be a part of it themselves.

In Hokekyo, Lord Buddha says that his laws have stood long and now the necessary truth must be preached-which truth he did preach in Hokekyo. Furthermore, he foresaw the difficulty of spreading his teachings after his death, and Hokekyo was to a large extent to provide for it. Nichiren read the Hokekyo scriptures with an amazing accuracy, and, believing himself the chosen instrument for conducting the campaign started a vigorous movement for spreading the Hokekyo teachings at a time when Japan was spiritually ruled by other sects of Buddhism. All these Buddhist sects more or less based their faith on the imaginative creatures or figures of Lord Buddha, indulged freely in metaphysical allegories, and taught salvation by trusting to Buddha whose omnipotent attributes were able to cover the multitude of sins by the hnman beings.

Divine Itervention :

Such an exposition of Buddhism made it appear as if the sufferings and sacrifices made by the Teacher were enough to redeem the sins of all generations of mankind Nichiren frowned upon this easy going form of faith, and spurned any and all attempts at half-hearted measures. He taught the importance of individual efforts, in order to secure salvation along the lines of moral excellence preached by the teacher, apart from a mere trust in him and his virtues. Moreover, he taught the democracy of the faith, and every one was on an equal footing before it—priest or layman Like every other reformer, he too was made the object of hatred, ridicule and of persecution at the hands of the Kamakura Shogunate on several

occasions. And each time he made a miraculous escape, which is attributed by Nichiren's followers to the act of Divine intervention.

Now for Nichirenism. First of all he taught the value of strenuous life. He would have his followers never cease fighting against the decline of faith, or for anything else calculated to uphold good order and efficiency. His followers believe that Nichiren's life was but a reflection of the Hokekyo, or an incarnation of that Law itself. Furthermore, it is a common belief among the Nichiren followers that Hokekyo gave nourishment to the spiritual life of the Japanese people for many centuries in the past, and helped the Oriental civilization to an extent unthought of.

Japan The Central Pivot :

When Nichiren started on his new mission of converting the Japanese people to the Hokekyo, he took an oath, consisting of three articles of faith. They are : (1) I will be the pillar of Japan : (2) I will be the eyes of Japan : (3) I will be the great ship of Japan. To understand the above sayings, it is absolutely necessary to realise that Nichiren was burning with patriotism which concerned itself with devotion to the cause of his country, its welfare and progress. It is an adoption of Buddha's sayings, and the name of Japan was substituted for that of the world as in the original. Nichiren's sayings sound egoistic, but the real meaning becomes plain when it is known that he intended to make Japan the central pivot from which to spread Buddha's gospel in the world, and to bring all the countries on the right path.

This is especially noteworthy in that Buddhism is preserved today in Japan in its most perfect form not alloyed. Again Japan is a country where all forms, of religious beliefs are tolerated and practised, therefore she is in the best position to adjudge correctly of the merits or demerits of these rival religions. Japan-where owing to her geographical situation the coming and going of waifs is rendered easier not even religions excepted—should strive hard to make herself the feeding bed for it, and thence to distribute the ripe seeds. Moreover, Japan is most conveniently situated for

the purpose, having witnessed the methodical development of the Buddhist faith, therefore the full establishment of the Hokekyo creed means the spiritual conquest of the world in the end.

Buddha's prophecy about the finding of means to propagate his faith, together with his injunction there upon. applies to Japan. Such being the case, the name of Japan in Nichiren's oath should be read in the sense of the whole world as in the Sanskrit original.

Three Articles of Faith :

His three articles of faith—pillar, eyes, and the great ship form the subjects of never-ending exposition. His followers believe in them. But in a pithy way, the pillar stands for the column of central strength and wisdom, the eyes for illumination of the Universe and exposing of evils ; and ship means the carrying of faith from one shore to another, or conveying the sceptical to the shore of enlightenment

Nichiren wrote some expository books on the essence of his espoused creed—Hokekyo. Among them the two—Kaimoku Sho and Kwanjin Hozon Sho—stand unrivalled for the catholicity of his purposes, and incidentally they give real insight into the construction and working of the Hokekyo. It places strees on the necessity of fighting and overcoming all the obstacles there are in this world for the attainment of the object, namely, spreading the Hokekyo teaching, which in a broad sense applies to the human affairs. Man is reminded of the ever-present obstacles ahead, in fighting which he must not lose courage. It is this characteristic of the Hokekyo which has made its followers the most militant of all Buddhist sectarians.

Buddhism produces ennui, so declare some of the Western scholars But in Japan the contrary is the case. Many draw inspiration from it, be they soldiers, scholars or businessmen The truth is that the creed has been taught in its most mordant and energetic form, and its idea, conforming with the Japanese conception of national unity and benevolence, has not been unfruitful of good results. At any rate, Nichiren presented Buddhism in a new

form vastly different from that which administered to the vanity of the powerful classes, and catered to their caprices.

He called his teachings the correct Law and it soon acquired a large namber of adherents. It is exactly 675 years ago that he proclaimed for the first time the famous formula of "Nam Myo Horenge Kho" (Glory to the Law of Lotus Flowers) at Kiyosumi, Boshu, against the early morning Sun. His name Nichiren is taken from the sun (Nichi) and Ren (Lotus). A grand temple is built in his honour at Mt. Minobu, the stronghold of the Nichiren sect. Besides there is a university for training young priests, the brightest of whom, it is contemplated, will be sent abroad some day as missionaries for spreading the Buddha's gospel after being fully equipped for the task in the institute.

There are over 390 books or treatises published by him, all in connection with his creed, which show him to be a great intellectual giant. At first, he studied the Shingon sect and later on the Tendai sect at Mt. Hivei near Kyoto. He died at the age of 61. The total number of Nichiren temples throughout Japan is estimated to be 3,639 of which 39 are the so called leading temples all, subordinated to the head temple at Mt. Minobu. The law in force makes it impossible to build any more temples or to abolish the existing ones. This applies to all sects of Buddfiism.

————

[Reproduced from The Standard Bearer, February 1928, Vol—1 No. 10. pages 595-600]

পরিশিষ্ট

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর একটি লেখা

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭—১৯৪১) অগ্নিযুগের এক শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী। পিতা বিরাজকৃষ্ণ, মাতা মহামায়া, আদি নিবাস বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রাম, যে গ্রমে রাসবিহারীর পূর্বপুরুষের বাস ছিল। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে শ্রীশচন্দ্র পিতৃব্য বামাচরণ ঘোষের বাড়িতে প্রতিপালিত হন। সে বাড়িটি চন্দননগরের ফটকগোড়া অঞ্চলে রাসবিহারীদের বাড়ির পাশে।

শ্রীশচন্দ্র ও রাসবিহারীর মধ্যে একটি আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী এবং শ্রীশের কাকা বামাচরণ বাল্যে খেলার সাথী ছিলেন, যৌবনে উভয়েই একই কর্মস্থলে সরকারী ছাপাখানায় চাকরী করতেন, পারালাবিঘাটি গ্রামের নবীনচন্দ্র সিংহের দুই কন্যাকে দুজনে বিবাহ করেন এবং চন্দননগরে কাছাকাছি দুটি বাড়ি করেন। রাসবিহারীর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ও শ্রীশের কাকীমা ব্রজেশ্বরী দেবী আপন সহোদরা ভগ্নী ছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র চন্দননগরে ডুপ্লে স্কুলে পড়ার সময় স্বনামধন্য অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে এসে গভীরভাবে স্বদেশ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৫ সালে এনট্রান্স পরীক্ষার পর কোলকাতায় 'হিতবাদী' পত্রিকায় একটি সাময়িক কাজ পান এবং সখারাম গনেশ দেউস্কর মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। ক্রমশ তিনি সমসাময়িক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীশচন্দ্রের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার অতি বৃহৎ এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অদৃশ্য আলোর মত তিনি বিচরণ করেছেন, সে আলো যেখানে পড়েছে সেখানটি উজ্জ্বল ইতিহাস হয়ে উঠেছে। নেতৃত্বের বাসনাহীন এই মহান কর্মীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর খুব সংক্ষিপ্ত তালিকা হল এই ঃ

চন্দননগরের মেয়র তার্দিভ্যাল-হত্যা প্রচেষ্টায় সহায়তা, যুগান্তর' প্রেস কোলকাতা থেকে চন্দননগরে স্থানান্তরিত করে কাগজটিকে পুলিশের উৎপাত থেকে রক্ষা করা, জেলখানায় কানাইলাল দত্তকে রিভলবার পেঁাছে দেওয়া, চন্দননগরে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা করা, রাসবিহারীকে বাংলার বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত করা, সিপাই-বিদ্রোহের পরামর্শ এবং সহায়তা করা, ডেন হ্যাম হত্যা-প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকা রডা কোম্পানীর লুণ্ঠিত 'মসার' পিস্তল রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ করা, চন্দননগরে বহিরাগত বিপ্লবীদের আত্মগোপনের ব্যবস্থা করা—শ্রী অরবিন্দ (১৯১০) থেকে দীনেশ মজুমদার (১৯৩৩) পর্যন্ত শতাধিক বিপ্লবী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীশচন্দ্রকে বৃটিশ পুলিশ চন্দননগরের ফরাসী এলাকার বাইরে পেলেই যে পাকড়াও করবে তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। ১৯১৫ সাল মার্চ মাস। শ্রীশচন্দ্র রাসবিহারীর প্রতিক্ষায় অস্থির, সিপাই-বিদ্রোহ অসফল হয়েছে, একে একে সকলে

ধরা পড়েছেন, রাসবিহারীকে নিরাপদ না করতে পারলে আর রক্ষা নেই। এই অবস্থায় কাকীমা শ্রীশকে আদেশ করলেন কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য। যে শ্রীশচন্দ্র ১৯০৮ সালে বৃটিশ কারারুদ্ধ কানাইলালকে রিভলবার পৌঁছে দিয়ে বিপ্লবের ঝাড়লণ্ঠন জেলেছিলেন, সেই শ্রীশচন্দ্র তাঁর খুড়তুতো বোনকে পৌঁছে দিতে পারলেননা—হাওড়া স্টেশনেই তিনি বৃটিশ পুলিশের হাতে ইনগ্রেস টু ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে বন্দী হয়ে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত হলেন। শ্রীশের কাকীমা জানতেন না শ্রীশ কোলকাতা যেতেন নিশাচরের মত, কৃষ্ণকায় দেহখানি রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে গোপন পায়ে চলা পথ দিয়ে, আবার রাতের অন্ধকারেই ফরাসী এলাকায় ফিরে আসতেন! প্রকাশ্যে ১৯১৫ সালে ভদ্রলোকের মত কোলকাতা যাবার উপায় তাঁর ছিলনা।

১৯২৪ সালে কারা মুক্তির পর সংসারের আপদ গণ্য হয়ে কাকীমার আশ্রয়টুকুও ঘুচে গেল। শ্রীশচন্দ্র মতিলাল রায়ের প্রবর্তক সংঘে আশ্রয় নিলেন। মতিলাল তাঁর অতি বিশিষ্ট বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন, রাসবিহারী মতিলাল সম্পর্কও শ্রীশের মাধ্যমে হয়েছিল। কিন্তু মতিলাল সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে গঠনমূলক কর্মসূচী নিয়েছিলেন, ওদিকে শ্রীশচন্দ্রের মনে বিপ্লব-বহ্নি-নির্বাপিত নয়। কয়েক বছর পরে শ্রীশচন্দ্র প্রবর্তক সংঘ ত্যাগ করে বেনোয়ারীলাল সাহার বাড়িতে চলে আসেন এবং বৈপ্লবিক যোগাযোগ চালিয়ে যান। দীনেশ মজুমদার কে শ্রীশচন্দ্রই চন্দননগরে এনেছিলেন ১৯৩৩ সালে।

রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে নিয়মিত চিঠিপত্র এবং বই পাঠাতেন। অতীব দুঃখের বিষয়, সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। নানা আশাভঙ্গ, দারিদ্র ও মানসিক পীড়নে শ্রীশচন্দ্র কিছুকাল উম্মাদ হয়ে কাটিয়েছেন। রাসবিহারীর পাঠানো জাপানী বই নগ্ন বক্ষে চেপে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে ও দেখা যেত। সেসব বই কোথায় হারিয়েছে কেউ খবর রাখেনি। তাঁর উম্মত্ত ভাব প্রশমিত বলে তিনি স্বাভাবিক ভাবে দেশ সেবা করতেন।

অগ্নিযুগের এই অমূল্যনিধি ১৯৪১ সালের ২রা মে আফিং খেয়ে প্রিয় স্বদেশ ভুমি ত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে যান।

* * * * *

১৯২৩ সালে, জাপানী প্রজা হিসাবে ঘোষিত হবার প্রাক্কালে এক প্রবল ভূমিকম্পে রাসবিহারীর আশ্রয়স্থলটি ভেঙ্গে পড়ে। এই বিপর্যয়ে রাসবিহারী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে দারুন বিপদে পড়েন কারণ তাঁর অজ্ঞাতবাস তখনো শেষ হয়নি। এই দুর্দিনে রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে একহাজার টাকা পাঠাবার জন্য চিঠি লেখেন।

শ্রীশচন্দ্র নিজে কপর্দকহীন ছিলেন, মহৎ হৃদয় ছাড়া আর কোন সম্পত্তি তাঁর ছিল না। তিনি রাসবিহারীর চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দিলেন—আশা করলেন, রাসবিহারীর বিপদের কথা জেনে ভারতবাসী নিশ্চয়ই অর্থ সাহায্য করবে।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা হল। সে অভিজ্ঞতার কথা তিনি "রাসের বিপদ" শীর্ষক রচনায় প্রকাশ করেছিলেন (প্রবর্তক ১৩৩০, ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ ১১৮)। সেই রচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

রাসের বিপদ

রাসবিহারী বসুকে সকলেই জানেন। তার বিপদ দেশের বিপদ তার বুভুক্ষা দেশের বুভুক্ষা, এইরূপ ধারণা নিয়ে আমি তার চিঠিগুলি ছাপিয়ে ছিলাম কিনা জানিনা, কিন্তু যখন সে লিখলে অন্তত হাজার টাকা টেলিগ্রাফ করে পাঠিয়ে দাও, সেই লেখা প'ড়ে জাপানের সমস্ত দুঃখ-কষ্টটা আমার খুবই কাছে এসে পড়ল।—দেখলুম, ভূমিকম্পে ভগ্নস্তূপের নিকটে ছোট ছেলোট ও মেয়েটি নিয়ে সস্ত্রীক রাস শূন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে, আর বলছে—হাজার টাকা পাঠিয়ে দাও।

এ ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা যায়না। কিন্তু টাকা কই—তখন একের পিঠে দুটো শূন্য দিয়ে ও যে কিছু পাঠাতে পারিনা!

তাই দেশকে ডেকে নিলুম। রাসের নিজের ভাষায় দেশকে শোনালুম—রাস চায় মাত্র হাজার টাকা, তোমরা দিবে কি?

দেশ সেবক বলে রাসকে ভালবাসে কজন, তা আমি আঙ্গুলে গুণেই বলতে পারতাম। কিন্তু রাসের নাম ডাক আছে, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই আবার দেখি মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কাজ করে, অনেকে সেই নামে শক্তির সন্ধান পায়। তাহলে রাসবিহারীর এই আকস্মিক বিপদে, বেশি জানুক আর না জানুক, রাসবিহারী ও তার বিপদ, এই দুটি শব্দে দেশের বুকে একটা সহানুভূতির ও ভালবাসার উৎস ফুটবে, এ বিশ্বাস বোধ হয় আমায় ছিল, নচেৎ চিঠিগুলো ছাপাব কেন?

কিন্তু চিঠি ছাপিয়ে টাকা তোলবার মত নিজের বল ও বাহিরের আবহাওয়া কিছুই দেখলাম না।

'প্রবর্তক সঙ্ঘে'র নামটি গ্রহণ করতে পারতাম, ছিল এইমাত্র সম্বল, কিন্তু রাসবিহারী, দিল্লী-লাহোর-বেনারস ষড়যন্ত্রের রাসবিহারী, পুলিশের ধরি ধরি নাই-রে হতশ্বাস শব্দে চতুর্দ্দিক বিভ্রান্তকারী রাসবিহারী যে দেশের একটা পাকা ভয়ের জিনিষ সেটা আমি বেশ ভালোই জানাতাম। তাই কোথায় হাত বাড়াব তা ঠিক করা আমার দায় হ'ল।

আমি ব্যক্তির পিছনে পিছনে না ছুটে যাঁরা ব্যক্তিবর্গের দান একত্র করে বেসরকারী-ভাবে জাপানকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছিলেন—সেইরূপ শ্রীরবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এই দুইজনকে চিঠি লিখলাম। বাংলা কংগ্রেস কমিটিকে ও বাদ দিই নাই। ফল হবে আশা হল, কবে হবে বুঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে কাগজওয়ালারা যথানিয়মে রাসবিহারীর চিঠি ছাপালে। রাসবিহারীর নিকট বা এমনকি আমার নিকট টাকা পাঠাবার কথা তাতে উল্লেখ করা হ'ল।

টাকা আমি পাই ১৫, (পনেরো টাকা,) রাস লিখেছে, সে ১, (এক টাকা) মনিঅর্ডার যোগে পেয়েছে।

তার টাকা চাওয়াটা ঘরোয়া ভাবে হয়েছিল, সেটাকে অত প্রকাশ্য করতে পত্রপত্রে বুঝলাম, সে একটু বিরক্ত হয়েছিল। বিরক্তির কারণ আর কিছুই নয়, সে যেন বলতে চায়—

"আমার ভিতরটা কি কেউ দেখেছে, দেশের জন্য সবটা পেতে দিয়ে যে বসে আছি সেটা কি কেউ দেখেছে,--তারা বোধ হয় দেখে, আমি বোমা আর রিভলবার, আমি ষড়যন্ত্রের একটা মস্ত খেলোয়াড়! তারা আমায় জানাবে কেন?—ঘুম না ভাঙলে তারা আমায় জানাবে কেন? তাদের কাছে টাকা চাওয়া কেন?"

আমি সবই বুঝতাম। তাই চুপ করেই ছিলাম চিঠিগুলি ছাপিয়ে। কিন্তু জাপানী সাহায্য উপলক্ষে সংহত দেশ-শক্তির সাহায্যের আশা আমি ছাড়তে পারি নাই। রাসবিহারীর 'হাজার টাকা পাঠাও' শব্দগুলো পড়েই কি যেন ঢুকেছিল, আর মনে হচ্ছিল—হাজার টাকা কি পাঠানো যাবে না!

Statesman একবার মিঃ বসুর নিকট জাপান প্রবাসী ভারতবাসীর জন্য সাহায্য পাঠাতে লিখলে। আবার বারণ করলে জেনে রাসবিহারী বসু একজন দুর্দান্ত বিপ্লবপন্থী। তার উত্তর অবশ্য দেওয়া হল। রাস তার উপর লিখেছে—

"...Statesman যাহা লিখিয়াছে তাহা উহার position থেকে ঠিকই।...তোমার প্রথম ভুল হইয়াছে যে এই কাগজের through দিয়ে appeal টা ছাপান। যা হইয়া গিয়াছে তার জন্য লড়ালড়ির দরকার নাই।"

আমি অবশ্য চিঠিগুলো Statesman অফিসে বয়ে দিতে যাই নাই। রিপোর্টার Servant দেখে ছুটে এসেছিল চন্দননগরে। আমি তার অনুরোধে মাত্র ভদ্রতা করে—চিঠিগুলো সম্পাদককে দিলুম,—এই বলে লিখে দিয়েছিলুম।

এসব ব্যাপরে রহস্য বেশ ছিল' বিচিত্রতা ও ছিল, কিন্তু কিছু টাকা না পাঠানোয় অন্তরে বেশ একটু বেদনা অনুভব করছিলাম। বন্ধুর পত্রে—"আচ্ছা লড়ে যাব, তোমরা তত ভয় খেয়ো না," এ সব ছিল, কিন্তু তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছিল না।

এমন সময় দেখি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের জাপান সাহায্য ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থ সর্বসমেত ৬২১, (ছশো একুশ টাকা) পাঠিরে দিলেন। উহা রাসবিহারীকে তখন পাঠান হল। তখন আবার হাজার টাকার কথা বেশী করে স্মরণ হ'ল। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও লালা লাজপৎ রায়কে আগে জানিয়েছিলুম, তাঁদের ও আবার দুখানা চিঠি লিখলুম। রাসবিহারী সম্বন্ধে এই অতি অবাস্তর কথাগুলি জানালুম, কিন্তু ইহাই এখন আমার নিকট একমাত্র কথা।

কিন্তু আর একটা সংবাদ পেয়ে আমার বড় আনন্দ হল।

সে লিখেছে—"You will perhaps be glad to know that I have got myself naturalised here. This will enable me to travel in any part of the world except the British possessions...Before thc naturalisation I was practically cooped up in a cage. I could not even travel

inside Japan freely, not to speak of visiting Korea, China or Russia. The British were all along keeping their eyes on me. But now I am beyond their control and jurisdiction and they can't do anything leagally."

এ খবরটা খুবই আধুনিক। কিন্তু এই রাসবিহারী সম্বন্ধে কয়েক বৎসর আগে Englishman পর্য্যন্ত কত বলশেভিক আফগান ষড়যন্ত্রেরই না কথা তুলেছিল! এইরূপে নামজাদা মানুষকে এক বর্ণ থেকে কত বর্ণে যে এঁকে ফেলে তা কে বলবে? রাসবিহারী সম্বন্ধে এমন অনেক অদ্ভুত ধারণা ভারতবর্ষে শুনা যায়।

জ্যোতিষ চন্দ্র সিংহ

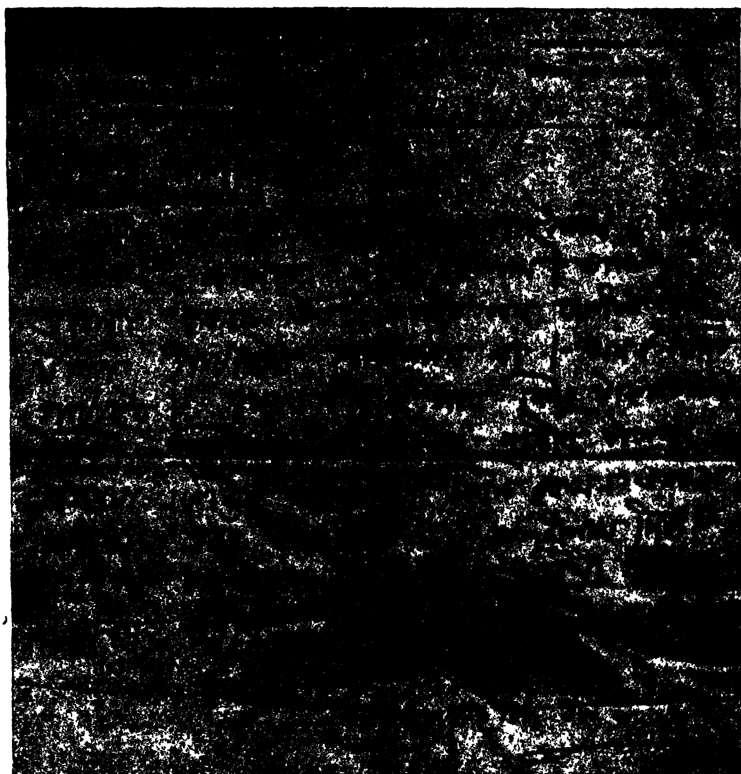
রাসবিহারীর আত্মকথায় উল্লিখিত 'পশুপতি' ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ (১৮৯৩-১৯৩৬, পিতা-গোবিন্দলাল, চন্দননগর)।

নির্ভিক দেশকর্মী, রাসবিহারীর প্রতিবেশী জ্যোতিষচন্দ্র নানাবিধ দুঃসাহসিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন। যে বোমা লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেটি তিনি গোপন কেন্দ্র থেকে এনে রাসবিহারীর কাছে জমা দিয়েছিলেন—এই তথ্য স্বয়ং মনীন্দ্র-নাথ নায়েক (যাঁর তত্ত্বাবধানে ওই বোমা নির্মিত) লিখে গেছেন। রাসবিহারীর পলাতক অবস্থায় জ্যোতিষচন্দ্র যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কিছু উল্লেখ রাসবিহারীর লেখার মধ্যেই রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জ্যোতিষচন্দ্র ফ্রান্সের পক্ষে স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে যোগ দেন এবং ভার্দুন বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি জাপান গিয়ে রাসবিহারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং চন্দননগরে বৈপ্লবিক কর্মসূচী পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস করেন। চন্দননগরের 'যুব সমিতি'র অন্যতম সভ্য ছিলেন, 'স্ফুলিংগ' নামে একটি পত্রিকা (লেনিনের ইস্ক্রা অনুসরণে) সম্পাদনা করেন। মতবাদের দিক থেকে গান্ধীজির অনুগামী না হয়েও ১৯৩০ সালে তিনি মেদিনীপুর অঞ্চলে আইন-অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগে তিনি বহু বে-আইনী ইস্তাহার ও কাগজপত্র নানা দিকে পেঁছে দিতেন। এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

॥ শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ॥

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৯৩—১৯৪৫) ১৯০৭ সালে কোলকাতার গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯০৯ সালে বারাণসীতে ইয়ং ম্যানস্ অ্যাসোশিয়েশন নামে বিপ্লবী দল গড়েন। পরে রাসবিহারী বসুর সহকারী হয়ে ভারতীয় সৈন্যদলে, বিশেষ করে ৭ম রাজপুত রেজিমেণ্টের বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১৫) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়ে আন্দামানে কারারুদ্ধ থাকেন। আন্দা-মান থেকে মুক্তি পেয়ে (১৯২০) পুনরায় বিপ্লবী সংগঠন গড়েন। উত্তরপ্রদেশে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৫ সালে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর প্রচেষ্টায় ধরা প'ড়ে দু বছর জেল হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর পুনরায় দ্বীপান্তর হয়। সেই সাজা শেষ হবার পর জাপানের সাহায্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবার চেষ্টায় ১৯৪১ সালে আবার বন্দী হন। জেলে রাজরোগ দেখা দেয়। জেল থেকে মুক্তি পেলেও গোরখপুরে অন্তরীণ থাকেন। অন্তরীণ অবস্থায় জীবনাবসান ঘটে।

রাসবিহারী বসুর বাংলায় লেখা চিঠি



রাসবিহারী বসুর বাংলায় লেখা আর কোন চিঠি আমরা খুঁজে পাইনি। অতি অন্তরঙ্গজনকেও তিনি ইংরাজীতে চিঠি লিখতেন—বৈমাত্রেয় ভাই বিজনবিহারী, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল রায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সকলকেই তিনি ইংরাজীতে চিঠি লিখেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম তাঁর বাল্যবিধবা আপন সহোদরা ভগ্নী শ্রীমতী সুশীলা বালা সরকার।

বাল্যবিধবা সুশীলার জীবন যে অনাদর ও আর্থিক দুর্দশায় ভরা সে কথা রাসবিহারী জাপানে গিয়ে বিস্মৃত হননি। তিনি যে ভগ্নীকে টাকা পাঠাতেন তার প্রমাণ ওই চিঠিতে রয়েছে। বিজনবিহারীকে লেখা পত্রেও রাসবিহারী সুশীলার খোঁজ নিয়েছেন, খোঁজ খবর রাখতে উপদেশ দিয়েছেন এবং কিছু আর্থিক সাহায্য করতেও অনুরোধ জানিয়েছেন। চন্দননগর ফটক গোড়ায় রাসবিহারীর পৈত্রিক বাড়ি (যে বাড়ির ছবি এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে) ভাড়া দিয়ে সেই ভাড়ার কিয়দংশ সুশীলাকে

দেবার প্রস্তাব তিনি বিজনবিহারীর কাছে করেছিলেন। ১৭ই জুলাই ১৯৩৭ সালে বিজনবিহারীকে লেখা একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করছি :···Do you correspond with Sushila ? If not, do so please. If your financial condition permits, remit to her sometimes Ten Rupees or so. She will no doubt be glad. Who is now living in our house ? I think it was rented. If so, what happened to the rent-money ? I think Sushila could now and them be helped out of the rent to a certain extent. What is your opinion ? If you agree, yon can take necessaey steps to effect it······[১] ১=বিজনবিহারী বসু : কর্মবীর রাসবিহারী।

রাসবিহারী ভগ্নী শ্রীমতী সুশীলা বালা সরকার জীবনের শেষ অধ্যায় কাশীতে কাটিয়েছেন। তিনি কেমন ছিলেন, সে বিষয় তাঁরই লেখা দুটি চিঠি আলোকপাত করবে। চিঠি দুটি চন্দননগরের রাসবিহারী স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রী বিভূতিভূষণ বিশ্বাস মহাশয়কে লেখা।

মান্যবরেষু,

আমি শ্রীমতী সুশীলাবালা সরকার ৺রাসবিহারী বসুর একমাত্র বাল্যবিধবা ভগিনী আমি দীর্ঘ ৪০/৪৫ বৎসর ৺কাশীধামে বসবাস করিতেছি। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর মহামান্য বাংলা গভর্মেণ্ট আমায় খোরাকি হিসাবে মাসিক সামান্য ২০ (কুড়ি টাকা) পেন্সেন দিবার ব্যবস্থা করেন। আমার আর অন্যকোন আয় নাই এবং এক্ষণে প্রতিদ্রব্যের দুর্মূল্যতা দরুণ সামান্য কুড়ি টাকায় (ইহা হইতে ব্যাংক কমিশন ও যাতায়াত বাবদ ২ টাঃ খরচ হইয়া যায়) আমায় জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আমার জীবিকা নির্বাহ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম আপনি ও সমিতির মাননীয় সভ্যগণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাসবিহার বসুর স্মৃতি রক্ষার্থের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন ইহা আপনাদের সহিত আমার ও গর্বের ও আনন্দের বিষয় আপনার নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যে যদি আপনি আপনার এই বৃদ্ধা ভগিনীকে আপনাদের সমিতি হইতে মাসিক কিছু অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করেন আপনাদের এই গরিব ভগিনী আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি অতি বৃদ্ধা হইয়াছি এক্ষণে আমার বয়স ৭০ বৎসরের উপর এবং চলৎশক্তি একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আশা করি আপনি ও আপনার সমিতি আমার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব যথাসাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। আপনি ও সমিতির অপর ২ ভ্রাতারা আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসা জানিবেন।

১৬।১০।৫৬ ইতি

সুশীলা বালা সরকার
কেঃ অঃ শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডু
D/২২।৬ চৌষট্টির ঘাট

এর পরের চিঠিটি ৬-১১-৬৬ তারিখে লেখা।

বারানসী
৬-১১-৬৬
রবিবার

স্নেহের

ভাই, তোমার প্রেরিত ২০ টাকা পাইরা যে কি আপার আনন্দ লাভ করিলাম তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি জানিতাম যে দাদার মৃত্যুর পর হইতে আমি অসহায় ও অনাথ হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আজ এই ৭২ বৎসর বৃদ্ধ অবস্থাতে প্রাণে নতুন করে উৎসাহও আনন্দ জাগিতেছে। কারণ আজ আমি আর অসহায় ও অনাথ নই—আমার পিছনে তোমার মত দেশের ভাইরা আছে। আমি এমন বৃদ্ধা হইয়াছি যে এই পৃথিবীতে হয়তো সামান্য দিনই বাঁচিয়া থাকিব। যদি তুমি তোমার সমিতির ভাইরা মিলে ব্যবস্থা করিয়া আমায় মাসিক কিছু করিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা কর তো আমার খুবই উপকার হয়। তুমি ও সমিতির সব ভাইদের আমার ৺বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ নিও ও দিও। তুমি বা সমিতির অপর ভাইরা যখনই ৺কাশীধামে আসিবে আমার সহিত দেখা করিও। অধিক আর কি ?

ইতি
আশীর্বাদিকা তোমাদের দিদি
সুশীলাবালা সরকার

কুড়িটি টাকা পেয়ে পূর্বএশিয়ার বিপ্লবমহানায়ক রাসবিহারী বসুর ভগ্নী শ্রীমতী সুশীলাবালা সরকার যে 'অপার আনন্দে' উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, তার চেয়ে গভীরতর আনন্দ হয়ত মৃত্যুই তাঁকে দিতে পেরেছে !

[উপরিউক্ত চিঠিগুলি চন্দননগরের রাসবিহারী স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ বিশ্বাস মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত—অ. কু. মি.]

সুমধুর স্মৃতি

রাসবিহারী বসুর জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী, শ্রীযুক্তা কেইকো হিগুচি ১৯৬৯ সালের ২৩ শে জানুয়ারী ভারতে এসেছিলেন। সংগে এসেছিলেন তাঁর এক মাসীমা শ্রীমতী য়োরিকো ইয়ানসে বান্ধবী ইকুকো কোডা এবং একজন জাপানী লেখক শ্রী জন তাকেমুরা। ভারতে আসার কারণ রাসবিহারীর জীবন সম্পর্কে কিছু প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা। শ্রীতাকেমুরা রাসবিহারীর জীবনী লিখছিলেন। দিল্লী হয়ে এঁরা কলকাতা আসেন, তারপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে রাসবিহারীর পৈত্রিক বাসভবন ইত্যাদি দেখতে আসেন। চন্দননগরে তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী, আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওঁরা জাপান রওনা হন। জাপানে পৌঁছে তাঁরা যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি উদ্ধৃত করা হল :

> Our first greetings from Tokyo to our dearest friends in Chandernagore. We came back safe with unforgetable memories of India, our dream country. How happy we were when we could find the people who still remembered our grandfather. We will never forget your warm kindness and scurutulous care. We are much oblidged to you all for your trouble. We will write to you very soon and thank you for the sweet. We enjoyed it very much—

Keiko Higuchi
Yoriko Yanase
Ikuko Koda

37, S. Chome Pendagagu
Spionyaku, Tokyo

এই চিঠির শেষ দুটি লাইনের জন্য শ্রীযুক্ত কেইকোর একটি গোপন কথা ফাঁস করে দিতে হচ্ছে।

চন্দননগরে ওঁদের সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়েছিল। জলভরা সন্দেশ কেই-কোর খুব ভালো লাগল। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, জলভরা সন্দেশ তিনি আর খাচ্ছেন না! তাঁকে অনুরোধ করা হল—যদি ভালো লাগে তো ওই মিষ্টি আর দুটো খান! তবুও কেইকো খেলেন না। শেষে সলজ্জ কণ্ঠে বলে ফেললেন—এই মিষ্টি খুউব চমৎকার লাগল এরকম কখনো খাইনি, এই দুটো আমি মায়ের জন্য জাপানে নিয়ে যাব।

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন—মায়ের জন্য ওই দুটো নিয়ে যেতে হবেনা, আপনি খান। মায়ের জন্য আমরা ওই সন্দেশ বাক্স ভরে আপনার সংগে দিয়ে দেব।

তাই দেওয়া হয়েছিল।

চিঠিতে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।